অজ্ঞাত বনকুসুম

সন্ন্যাসী, তপস্বী, যোগীওভক্তদিগের
সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ।

নারায়ণানন্দ তীর্থ
কর্তৃক সংগৃহীত

অজ্ঞাত বনকুসুম

সন্ন্যাসী, তপস্বী, যোগী ও ভক্তদিগের
সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ।

নারায়ণানন্দ তীর্থ
কর্তৃক সংগৃহীত

প্রকাশক—
শ্রীকল্যাণ কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
৯৪, ভদৈনী, বারাণসী—২২১০০১

প্রথম প্রকাশ ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৩
মূল্য—তিন টাকা মাত্র
এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী .বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারীদের সেবায় ব্যয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
৯৪, ভদৈনী; বারাণসী—২২১০০১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅনুপ কুমার দত্ত
অনুপ প্রিণ্টার্স
রামাপুরা, বারাণসী।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রাক্‌কথন ১

উৎসর্গ ৫

প্রথম কুসুম—ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমযোগী মহাত্মা শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র— ৬

দ্বিতীয় কুসুম—ভক্তিমতী শ্রীমতী কান্‌হু— ২৬

তৃতীয় কুসুম—ভক্তিমতী পতিতা শ্রীমতী মাধুরী— ৪০

চতুর্থ কুসুম—শিবভক্ত মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর— ৫২

পঞ্চম কুসুম—ত্যাগী পণ্ডিত শ্রীবুনোরাম— ৭৪
(শ্রীরামনাথ শিরোমণি)

ষষ্ঠ কুসুম—ভক্তপ্রবর শ্রীঅর্জুন মিশ্র— ৮১

সপ্তম কুসুম—গৃহস্থযোগী শ্রীতারিণী চরণ— ৯৫

অষ্টম কুসুম—তপস্বিনী শ্রীমতী গঙ্গাদেবী— ১১২

নবম কুসুম—আদর্শ গুরুভক্ত মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৮

প্রাক্‌কথন

লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অরণ্যে নানা প্রকার বৃক্ষে লাল, নীল, সাদা, পীত প্রভৃতি বহু বর্ণের এবং বিবিধ আকারের সুন্দর সুন্দর কতই না ফুল ফুটিয়া থাকে। ঐ সকল পুষ্পের আবার গন্ধও এক রকম নহে—অনেক রকমের। যথাসময়ে গাছে পুষ্প বিকশিত হয় এবং যত দিন উহাদের থাকিবার নির্দিষ্ট সময় তত দিন অবস্থান করিয়া উপযুক্ত সময়ে আবার ঝরিয়া পড়ে। ঐ সকল মনোহর প্রসুনের রূপ বা সৌন্দর্য কেহ দেখিল কিনা এবং সৌরভ কেহ গ্রহণ করিল কিনা, সেদিকে তাহাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না। ফুল ফোটা এবং কিছু কাল থাকিয়া ঝরিয়া পড়াই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বা কর্ম। উহাদের জন্মগত স্বাভাবিক বাস উহারা বাতাসের মাধ্যমে জগৎকে বিতরণ করিয়াই উহাদের ক্ষুদ্র জীবনের পরিসমাপ্তি করিযা দেয়। ইহার অধিক কুসুমের জীবন ধারণের আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পুষ্পও এইভাবে তাহার জীবন শেষ করা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভব করে না।

সংসারে আমরা দেখিতে পাই ঠিক এই রকম বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যোগী ও মহাপুরুষগণ তাঁহারা মানবের অজ্ঞাতসারে জগতে আসেন এবং সাধনার দ্বারা আপন আপন অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া যেমন অজানাভাবে সংসারে আসিয়াছিলেন তেমনি অজানা-

ভাবে বা গোপনে আবার নিজ নিজ সাধনোচিত অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যান। কেহই তাঁহাদের কোন সংবাদ রাখে না এবং রাখিবার চেষ্টাও বড় কেহ করে না। যাহারা দুই চারি জন তাঁহাদের বিষয় কিছু জানে তাহারাও জগৎকে তাঁহাদের জীবনগাথা জানাইবার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। এই ধরণের কয়েকটি মহাপুরুষ ও ভগবদ্ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই "অজ্ঞাত বনকুসুম" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস করিতেছি। এই সকল সাধক ও সাধিকাদের জীবনী সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায় নাই, তথাপি যতটা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহাদ্বারা যে তাঁহাদের কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না তাহা জানিয়া শুনিয়াও যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ শুদ্ধ পবিত্রাত্মা সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যোগী ও মহাপুরুষদের পূত জীবন বৃত্তান্ত আলোচনার দ্বারা নিজকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন। সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা, যোগ-আরাধনা ইত্যাদি তো এই অপটুদেহের দ্বারা কিছু সম্ভব নহে, তাই এইভাবে সাধক ও সাধিকাদের বিশুদ্ধ জীবন স্মরণ-মনন করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত করিবার চেষ্টা।

আটটি বনকুসুমদ্বারা গ্রথিত এই ক্ষুদ্র মালা। এই মালার পুষ্প কয়টি আহরণ করিয়াছি বিভিন্ন স্থান হইতে। প্রথম চারিটি ফুল চয়ন করিয়াছি উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত হিন্দী পুরাতন মাসিক পত্রিকা কল্যাণ হইতে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ কুসুম সংগৃহীত হইয়াছে কাশীর প্রাচীন পণ্ডিতদের মুখনিঃসৃত বাণী হইতে। সপ্তম ও অষ্টম কুসুম লেখক তাহার বাল্যাবস্থায় কাশীধামে স্বয়ং

দেখিয়াছে এবং তাঁহাদের স্নেহে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে। মহাপুরুষদের জীবনচরিত আলোচনারূপ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া কেবলই ভয় হইতেছে পাছে নিজের অসমর্থতা নিবন্ধন তাঁহাদের মহিমা ও মর্যাদার লাঘব না করিয়া ফেলি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়ে একটি অতি সুন্দর শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১০।৪।৪৬

মহামুনি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—মহতের মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে মানবের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্মাদিসাধ্য স্বর্গাদি পরলোক এবং সকল সাধনের মূলীভূত কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি এরূপ কিছু ত্রুটি অজ্ঞতাবশতঃ এই পুস্তকে কোথায়ও হইয়া থাকে তাহা হইলে মহাত্মাগণ এবং সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকারা কৃপা করিয়া যে এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ক্ষমা করিবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।

পরমারাধ্যা বিশ্বজননী পরমস্নেহময়ী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর একনিষ্ঠ পরমভক্ত ছিলেন নিউ দিল্লী নিবাসী ভারত সরকারের অবসর প্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারী শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের জীবন-চরিত পড়িতে ভালবাসিতেন। তিনি আজ ইহলোকে নাই। তিনি গত বৎসর রাধাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিকালে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে পুণ্যক্ষেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীভাগবত-জয়ন্তী উৎসরের মধ্যে তাঁহার সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত

অনুগত সন্তান এবং আমাদের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুজিত কুমার দত্ত (পাটুন) তাহার পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতিকল্পে তথা তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে এই পুস্তকখানার সম্পূর্ণ মুদ্রণের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে ইহা কখনও সর্বসাধারণের করকমলে পৌঁছিত কিনা সন্দেহ। কারণ এই দুর্দিনে একজন ভিক্ষুক কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর পক্ষে পুস্তক ছাপান কেবল অসাধ্যই নহে বরং অসম্ভব কার্য। এই অযাচিত সাহায্যের জন্য তাহাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীস্ জানাই-তেছি এবং শ্রীশ্রীমাতৃচরণে শ্রীমানের ঈপ্সিত ধর্মজীবন ও মাতৃকৃপা প্রার্থনা ছাড়া একজন সন্নাসী আর কি প্রার্থনা করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ধর্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্ম-মরণাদি মহৎ সংসার-ভয় হইতে মানবকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।

শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমী, ১৩৮২ সাল
১২ই অক্টোবর, ১৯৭৫ খৃঃ
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
বারাণসী

নিবেদনমিতি
নারায়ণানন্দ তীর্থ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ও তাঁহার গর্ভধারিণী শ্রীশ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরি।
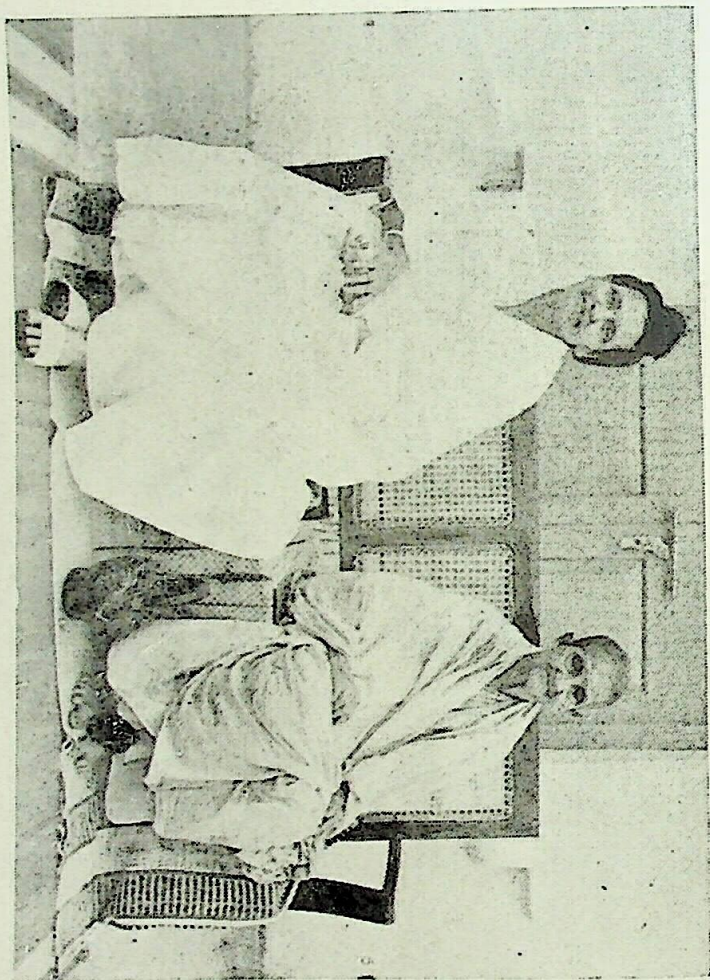
উৎসর্গ

পরমারাধ্যা বিশ্বজননী পরমস্নেহময়ী করুণাময়ী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়া
জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন,
যিনি সদাই তাঁহার আশ্রিত জনের হিত-
কামনায় তৎপর থাকিতেন এবং বিশ্বের
প্রত্যেক প্রাণীর জন্য, এমন কি পশুপক্ষীর
জন্য পর্যন্ত যাঁহার হৃদয় দয়ায় বিগলিত
হইত, সেই ব্রহ্মলীন পরমপূজ্যা
শ্রীশ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর
পুণ্য স্মৃতিকল্পে
"অজ্ঞাত বনকুসুম"
শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি

স্নেহধন্য

নারায়ণানন্দ তীর্থ

শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমী, ১৩৮২ সাল
১২ই অক্টোবর, ১৯৭৫ খৃঃ
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
বারাণসী

অজ্ঞাত বনকুসুম

প্রথম কুসুম

ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমযোগী মহাত্মা শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র

পুণ্যসলিলা ভগবতী কাবেরী নদীর তটের অধিকাংশ সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণ শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তপস্যার জন্য আজও নিজেদের অতিশয় গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। তিনি সেই সময়কার একজন অতি বড় অধ্যাত্মবাদী এবং অত্যন্ত অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। জন্ম হইতেই তিনি ছিলেন অতি বৈরাগ্যবান্ ও কঠোর তপস্বী। মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র কুম্ভকোনমের নিকটবর্তী কাবেরী নদীর তটস্থিত তিরুবিশনল্লুর গ্রামকে স্বীয় পবিত্র অবস্থিতির দ্বারা ধন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তান্‌জোরের মহারাষ্ট্রী শাসক শাহজী ঐ গ্রামটিকে ছিয়াল্লিস জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া উহার নাম রাখেন শাহজীপুরম্। উপর্যুক্ত ঐ ছিয়াল্লিশ জন বিদ্বানের মধ্যে শ্রীমোক্ষ সোমসুন্দর অবধানিও ছিলেন একজন। তিনিই আমাদের আলোচ্য শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের জনক। তাঁহার গর্ভধারিণীর নাম ছিল শ্রীমতী পার্বতী দেবী। পতিপত্নী উভয়েই ছিলেন অতিশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং ধর্মপরায়ণ।

মহাত্মা সদাশিবের বাল্যাবস্থা হইতেই বিদ্যাধ্যয়নের প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। সেইজন্য তাঁহার পিতামাতা পুত্রকে অল্পবয়সেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়াছিলেন। সে সময়কার ঐ দেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথানুসারে সদাশিবের পিতামাতা তাঁহাকে বাল্যাবস্থায়ই উপনয়নের পর বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্রবধূকে যথাসময়ে ঘরে আনিবার পর তাঁহারা পুত্রকে গুরুর নিকট হইতে পাঠ ছাড়াইয়া বাড়ীতে আনিলেন। বধূ শ্বশুরালয়ে আসার পর কুলাচার অনুযায়ী গৃহে বধূ-আগমন উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। সদাশিবকে বলা হইল সে যেন সেই দিন কিছু না খাইয়া উপবাসী থাকে। ভোজনের অতিশয় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বিচারশীল বৈরাগ্যবান্ সদাশিবের মনে স্বভাবতঃ উদয় হইল, বিবাহিত জীবন বড়ই দুঃখময়। এখনও তো ইহার আরম্ভই হয় নাই—কেবল শ্রীগণেশ মাত্র, ইহার মধ্যেই তাহাকে আহারের জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। না জানি পরবর্তী গৃহস্থজীবনে তাহাকে আরও নানা প্রকার কতই না দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। এই সব চিন্তা করিয়া যুবক সদাশিব তখনই সাবধান হইলেন; যাহাতে ভবিষ্যতে আর ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়। যাঁহাদের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ দুঃখ লেখেন নাই তাঁহাদের সামান্য কারণ বা ঘটনাতেই চৈতন্যের উদয় হয়। তাহার অন্তরে বৈরাগ্যের তীব্র অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। যে বয়সে সাধারণ মানুষ বিবাহিত জীবনের কতই মধুর স্বপ্ন দেখে সেই বয়সে যুবক সদাশিব চিন্তা করিয়া স্থির করিল আত্মানুসন্ধানই মানবজীবনের চরম কর্তব্য এবং তৎপ্রাপ্তিতেই পরম শান্তি। অতএব আর বৃথা সময় ক্ষেপ না করিয়া সেই শুভমুহূর্তেই বিবেকী সদাশিব গুরুর অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক

বৎসর পুর্বে পাঞ্জাবের খান্না নামক স্থানের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীত্রিবেণী পুরী মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, "য়হ আশীর্বাদ হ্যায় মেরা। শুভকর্ম করনে মেঁ ন করো দেরী।" আমাদের পরম স্নেহময়ী, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও বলিয়াথাকেন, 'যো কল করোগে সো আজ করো। যো আজ করোগে সো অভি করো।"

রাবণের তিনটি শুভ সংকল্প ছিল। প্রথম ইচ্ছা ছিল স্বর্গের সিঁড়ী নির্মাণ করিয়া দিবেন যাহাতে সকলে অনায়াসে স্বর্গে যাইতে পারে। দ্বিতীয় মেয়েদের রান্না করিতে আগুনের ধোঁয়াতে কষ্ট হয় বলিয়া অগ্নিকে ধূমশূন্য করিবেন এবং তৃতীয় সুবর্ণে সুগন্ধ করিয়া দিবেন। আজকরি কালকরি করিতে করিতে দীর্ঘসূত্রতার জন্য তাহার জীবনে আর এই শুভকর্ম সম্পন্ন করা হয় নাই। একটি প্রচলিত কিংবদন্তি আছে—"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্।" রাবণ অশুভকর্ম সীতাহরণ করিতে বিলম্ব করিলে সবংশে এত সত্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। নীতিশাস্ত্র এই কারণে নির্দেশ করিতেছে শুভকর্ম যত শীঘ্র সম্পন্ন করা যায় ততই মঙ্গল এবং অশুভ কর্ম যত বিলম্বে কার্যে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত ; না করিতে পারিলেই উত্তম। লোকে বলিয়া থাকে শুভকর্ম সম্পাদনে দেবতারাও বাধা দিয়া থাকেন। ইহার উদাহরণ দৈত্যরাজ বলির দানযজ্ঞে গুরু শ্রীশুক্রাচার্য পর্যন্ত বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

গুরু ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তির পথ দেখাইবেন কে? ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যতীত শান্তি কোথায়? ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মানুসন্ধান একই কথা। শ্রীশ্রী ভগবান্ই আত্মারূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। সেই সময় দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুরমের কামকোটি মঠের প্রসিদ্ধ মহাত্মা

পরমহংস দণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীমৎস্বামী পরমশিবেন্দ্রের সুখ্যাতি ও ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং যোগাভ্যাসের কথা লোকের মুখে শ্রবণ করিয়া শান্তিপিপাসু সদাশিব তাঁহার পদ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যই গুরু উত্তম অধিকারী জানিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্র প্রদান করিলেন। স্বামী পরমশিবেন্দ্রের শিষ্যের যোগপাট অর্থাৎ নাম হইল স্বামী শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র। ইহার পর হইতে তিনি গুরুর নিকট থাকিয়া দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মবিচার এবং কঠোর যোগ-সাধন করিতে লাগিলেন।

দেহে আত্মবোধ অর্থাৎ "দেহই আমি" ইহাই হইল সংসার-বন্ধনের মূল কারণ। ভববন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন শাস্ত্রানু-মোদিতরূপে শ্রীগুরুর সকাশে অবস্থানকরতঃ ব্রহ্ম-বিচার ও যোগা-ভ্যাস। একটি প্রচলিত কথা আছে সিংহিনীর দুগ্ধ সুবর্ণ পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে রাখা যায় না, নষ্ট হইয়া যায় বা জমিয়া যায়। সেই জন্য দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের জন্য চাই শুদ্ধ আধার। শুদ্ধ আধার নির্মাণ হয় নিদিধ্যাসনদ্বারা—একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বার বার তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তার নাম নিদি-ধ্যাসন। নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের পরিপক্ব অবস্থাই সমাধি। সমাধি আয়ত্ত করা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা। আর এই যোগাভ্যাস করিতে হয় উপযুক্ত সমাধিসম্পন্ন শ্রীগুরুর নির্দেশ মত। সেইজন্য উত্তম অধিকারী সদশিব ব্রহ্মেন্দ্র ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু শ্রীপরমশিবেন্দ্রের নিকট অবস্থান করিয়া অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস ও ব্রহ্মবিচারে কালতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের বিধান বুঝিবার শক্তি আমাদের মত সাধারণ মানবের নাই। তিনি কেন যে কি করেন তাহা আমাদের বুদ্ধির

অগম্য। তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার সকল কার্যের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে উহা যতই প্রতিকূল হউক না কেন। সদাশিবের গুরু শ্রীমৎ স্বামী পরমশিবেন্দ্রের নিকট অধ্যাত্মজ্ঞানের পিপাসু সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণ পরম শান্তির জন্য বহুদূর হইতে আসিতেন। যুবক নবীন সন্ন্যাসী সদাশিব তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনা, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন, ব্রহ্ম-বিচারের প্রক্রিয়া এবং যোগানুষ্ঠানের কোন না কোন সূত্র ধরিয়া প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিতেন। গুরু পরমশিবেন্দ্রর এই বৃথা তর্ক-বিতর্ক মনঃপুত ছিল না। একদিন তিনি কৃত্রিম রাগের স্বরে শিষ্যকে বলি-লেন—"তুমি কথা বলা বন্ধ করিবে কবে?" উপযুক্ত বিচারশীল শিষ্য গুরুর ইহা বলিবার অভিপ্রায় এবং ইহা তাঁহার করুণা-প্রসাদ জানিয়া সেই মুহূর্তেই সজাগ হইয়া গেলেন এবং চিরদিনের মতন মৌনব্রত ধারণ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি "মৌনযোগী" নামে সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি ব্রহ্মচিন্তা, যোগাভ্যাস এবং গ্রন্থরচনায় মনঃসংযোগ বা আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচিত "আত্মবিদ্যাবিলাস" নামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি তাঁহাকে শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্য জগদ্গুরু শ্রীশিবাভিনব-সচ্চিদানন্দ নৃসিংহ ভারতীর কৃপাপাত্র করিয়াছিল। মৌনব্রত ধারণ করিবার কিছুদিন পর দণ্ড, কমণ্ডলু ও কাষায়বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র অবধূত হইয়া গেলেন এবং সর্বদা তিনি সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। দীর্ঘকাল সাধন ও যোগাভ্যাস করিয়া যাহা লাভ হয় না তাহা তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া

ফেলিলেন। এমনই ছিল তাঁহার অধ্যবসায় ও সাধনে একাগ্রতা। সাথে সাথে গুরুকৃপা তো পূর্ণমাত্রায় ছিলই।

এক সময়কার ঘটনা। তিনি এক ধানক্ষেতের আইলকে মাথার বালিশ করিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষেত্রের কৃষকগণ তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, ইনি বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আরামে ইঁহার এখনও আসক্তি আছে। এই কথা মহাত্মা সদাশিবের মনে যাইয়া আঘাত করিল। কৃষকগণ এই রকম উপহাসবাক্য বলিয়াই চলিয়া-গেল কিন্তু তিনি এই বিদ্রূপবাক্যের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করিয়া ক্ষেতের আইলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আরাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক এখন বায়ুর আধারে শূন্যে অর্থাৎ ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ কৃষকগণ তাহাদের গন্তব্যস্থান হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার যোগশক্তি প্রদর্শনের নিন্দা করিল। সমা-লোচনার হাত হইতে মানব তো কোন ছার দেবতা পর্যন্ত রেহাই পায় না। মহাত্মা সদাশিব সাবধান হইয়া গেলেন। আত্মবিচার দ্বারা নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেইস্থান হইতে উঠিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে আপন মনে চলিতে লাগিলেন। পরিধানে বস্ত্র তো ছিলই না—দিগম্বর বেশ—শরীরের উপরও কোন আচ্ছাদন নাই, একেবারে নিরাবরণ এবং থাকিবারও এখন কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। শরীর রক্ষার জন্যও চেষ্টা নাই—যখন যেখানে যাহা অনায়াসে মিলিত তাহাই তিনি করপাত্রে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেন। তিনি এখন প্রকৃতই করপাত্রী হইলেন। পিপাসা পাইলে

কোন জলাসয়ে যাইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। তিনি সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই অবস্থার বিবরণ তাঁহার "অদ্বৈতবিদ্যাবিলাসে" এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

আন্তরমেকং কিঞ্চিৎ সংততমনুসংদধন্মহামৌনী।
করপুটভিক্ষামশ্নন্নটতি হি বীথ্যাং জরাকৃতিঃ কোঽপি ॥

সংসারের প্রতি পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া তিনি নৈরাশ্যের দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিলেন। শাস্ত্রে আছে "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" কোন বস্তুর, কি ব্যক্তির, কি স্থানের আশা করিলে যদি সেই আশা পূর্ণ না হয় তাহা হইল আশাভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য বিচারশীল ব্যক্তি যিনি জীবনে দুঃখ পাইতে ইচ্ছা করেন না তিনি কিছুরই বাসনা করেন না। বাসনাহীন পুরুষই সংসারে বাস্তবিকপক্ষে সুখী। তাঁহার চিত্তবৃত্তি শান্ত হইয়া গেল এবং বৃক্ষের তলায়ই নিজের বিশ্রামস্থল নির্দিষ্ট করিয়া লইলেন! তিনি নির্জন নদীর তটে কুঞ্জগৃহে পুলিনশয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন। বায়ু তাঁহার ব্যজনী বা চামর এবং আকাশের পূর্ণচন্দ্র হইল তাঁহার দীপ। এই প্রকার ছিল তাঁহার জীবনযাত্রা। যোগীর জীবন, সন্ন্যাসীর জীবন কেমন হওয়া উচিত একটি শ্লোকে তাহা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।

ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিঃ প্রিয়াগেহিনী।
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।

শয্যা ভূমিতলং দিশো বিবসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্।
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাৎ ভয়ং যোগিনঃ ॥

ধৈর্যই যাহার পিতা, ক্ষমাই মাতা, শান্তিই প্রিয়া স্ত্রী, সত্যই পুত্র, দয়াই ভগিনী, মনের সংযমই ভাই, ভূমিই শয্যা, দিশাই বস্ত্র এবং জ্ঞানরূপ অমৃতই ভোজন, এই সকল যাহার কুটুম্ব, সেই বিবেকী যোগীর সংসারে কাহা হইতে ভয় হইতে পারে? মহাত্মা পরম যোগী শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের জীবন আজ এইরূপ। তাঁহার "আত্মবিদ্যা-বিলাস" গ্রন্থে স্বীয় দিগম্বরস্থিতির বর্ণন এই প্রকার পাওয়া যায়।

আশাবসনো মৌনী নৈরাশ্যালংকৃতঃ শান্তঃ।
করতলভিক্ষাপাত্রস্তরুতলনিলয়ো মুনির্জয়তি॥
বিজননদীকুঞ্জগৃহে মঞ্জুলপুলিনৈকমঞ্জুলতরতল্পে।
শেতে কোঽপি যতীন্দ্রঃ সমরসসুখবোধবস্তুনিস্তন্দ্রঃ॥
ভূতলমৃদুতরশয্যঃ শীতলবাতৈকচামরঃ শান্তঃ।
রাকাহিমকরদীপো রাজতি যতিরাজশেখরঃ কোঽপি॥

যতিরাজ সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র পরব্রহ্মে লীন হইয়া জড়ের ন্যায়, বধিরের ন্যায় এবং ভূতাবিষ্টের ন্যায় চারিদকে আপন মনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে পাগল মনে করিত; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব মহাত্মা পরমশিবেন্দ্র তাঁহার শিষ্যের বাস্তবিক অবস্থা উত্তমরূপে জানিতেন। তিনি শিষ্যের প্রশংসা করিতে যাইয়া স্বয়ং দুঃখ করিয়া বলিতেন আমার হৃদয়ের পরিপাক বা চিত্তশুদ্ধি এমন হয় নাই, আমি এইরূপ ব্রহ্মোন্মাদের অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, যেমনটি সদাশিবের হইয়াছে।

উন্মত্তবৎসংচরতীহ শিষ্যস্তবেতি লোকস্য বচাংসি শৃণ্বন্।
খিন্নস্তু বাচস্য গুরুঃ পুরাহো হ্যুন্মত্ততা মে নহি তাদৃশীতি॥

পিতামাতা কামনা করেন পুত্র আমা হইতে অধিক বিদ্বান্ হউক; বড় হউক এবং যশস্বী হউক। ইহাতে তাঁহারা যেমন সুখী হন এমন আর কেহই হন না। গুরুও তদ্রূপ ইচ্ছা করেন শিষ্য আমা হইতে অধিক জ্ঞানবান্ ও উন্নত হউক। তাহাতেই তিনি অধিক গৌরবান্বিত মনে করেন। পিতা, মাতা ও গুরু এই তিনজন ছাড়া জগতে কেহই নিজ হইতে অন্যকে অধিক বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, উন্নত ও সম্মানিত দেখিতে ইচ্ছা করেন না। পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় কেবল পিতামাতা ও গুরুই কামনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই ইহাদের স্থান সকলের উপরে।

মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের অবধূত অবস্থা বড়ই অদ্ভুত ছিল। তিনি ঘোর অরণ্যে কিংবা জনমানবহীন পুলিনে বিশ্রাম করিতেন। কখনও বা কাবেরী নদীর তটে বালুকারাশির উপর শিলাখণ্ডের ন্যায় জড়ীভূতাবস্থায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এই সময়কার এক ঘটনা—তিনি ত্রিমূর্তিক্ষেত্রে কাবেরীর রমণীয় তটে কোড়মুড়ী স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভাবের তীব্র উন্মাদনায় সহসা তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি একটি বালুকাস্তূপের উপর বসিয়াছিলেন। হঠাৎ কাবেরী নদীতে বান ডাকিল। লোকে মনে করিল বানের জলের সহিত মহাত্মা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনার তিন চারি মাস পর এক কৃষক নদীর তীরে বালু আনিবার জন্য গিয়া যেই সেই বালুর উপর কোদালের আঘাত করিল অমনি কোদাল রক্তরঞ্জিত দেখিয়া সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া

গেল। সে অতি ধীরে ধীরে কোদালের দ্বারা বালুকারাশি সরাইতেই দেখিল মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র তথায় উপবেশন করিয়া আছেন। এই কৃষকরাই তিন চারি মাস পূর্বে মনে করিয়াছিল তিনি নদীর খরস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা সমাধি ভঙ্গের সাথে সাথে উঠিয়া নিরুদ্বেগে কোন প্রকার মানসিক অশান্তি প্রকাশ না করিয়া অপর দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ধীর স্থির আনন্দ-ময় মূর্তি দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন কোন প্রকার অপ্রীতি-কর কিছুই ঘটে নাই। ইহা অতি সত্য কথা যে ব্যক্তি আপন জীবনে ব্রহ্মানন্দরসের অতুলনীয় আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহার নিকট জাগতিক কোন ঘটনার—আমাদের দৃষ্টিতে তাহা শুভই হউক কি অশুভই হউক, কিছুমাত্র মহত্ব নাই। তিনি তো সর্বত্র ব্রহ্মই দর্শণ করেন।

যদ্যপি প্রকৃত মহাত্মা আধ্যাত্মিক চমৎকার ও অনায়াসপ্রাপ্ত যোগসিদ্ধির প্রদর্শন হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন তথাপি অধ্যাত্ম সাধনার ফলস্বরূপ তাহার মধ্যে বিদ্যমান তেজ ও যোগশক্তি মানবকে প্রায়ই প্রভাবিত করিয়া থাকে। এক সময়কার কথা—

শ্রমিকরা ক্ষেতের ধান কটিয়া আটি বাঁধিয়া রাখিতেছিল। রাত্রির সময়, অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে! মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র আপন ভাবে বিভোর হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধানের আটির হোঁচট লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। যাহারা ধান কাটিতেছিল তাহারা মনে করিল চোর ধান চুরি করিতে আসিয়াছে। তাহাকে মারিবার জন্য যেই তাহারা হাত উঠাইয়াছে অমনি না জানি কোন অচিন্ত্য

শক্তির প্রভাবে তাহাদের হাত উত্থিতই রহিয়া গেল! পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রস্বামী আসিলে যাহারা ধান কাটিতেছিল তাহারা সব কথা তাহাকে বলিল। মহাত্মা সদাশিব রাত্রি হইতেই তথায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যুষে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইলে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগিবর স্থানত্যাগ করিবার সাথে সাথে যাহারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের উত্থিত হাত স্বতঃই নামিয়া গেল এবং পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক সুস্থ হইল। যিনি কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া সর্বদা আত্ম-চিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন তাঁহাকে সর্বপ্রকারে রক্ষার ভার শ্রীভগবান্ই করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

যিনি অনন্যভাবে অর্থাৎ কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য আশা না করিয়া সর্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া আমার উপাসনা করেন তাঁহার যোগ এবং ক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধবস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা আমিই বহন করিয়া থাকি। ইহা হইতে বড় আশার বাণী আর মানবের পক্ষে কি হইতে পারে? এই প্রকার যোগীকে শ্রীভগবান্ই রক্ষা করিয়া থাকেন।

সাধু মহাত্মাদের দ্বারা কাহারও কখন কোন প্রকার অহিতের সম্ভাবনা নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহারা সদা মঙ্গলস্বরূপই হইয়া থাকেন। সাথে সাথে ইহাও অতি সত্য কথা, যদি তাঁহাদের প্রতি কেহ কোন প্রকার অপরাধ কিংবা অন্যায় আচরণ করে তাহা

হইলে শ্রীভগবানের বিধান অনুসারে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। সাধু, সন্ন্যাসী স্বয়ং কাহাকেও শাস্তি দিতে চাহেন না, কারণ তিনি সর্বভূতে অন্তর্যামী শ্রীভগবান্‌কেই দর্শন করেন এবং তিনি সদাই রাগ-দ্বেষ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই পরম সত্য একটি ঘটনার দ্বারা এখানে প্রমাণ করা যাইতেছে—

মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র কোন সময় একাকী এক বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার ভাবোন্মত্ত অবস্থা। শরীর বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। কোন উচ্চ রাজকর্মচারীর বাড়ীর জ্বালানীকাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য কতিপয় ব্যক্তি ঐ জঙ্গলে কাষ্ঠ কাটিতেছিল। কাষ্ঠ বহন করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন। সম্মুখে বলিষ্ঠ মহাত্মাকে পাইয়া তাঁহারই মাথায় কাষ্ঠের বোঝা চাপাইয়া দিল। পরমযোগী সদাশিব কোন রকম আপত্তি বা অভিযোগ না করিয়া কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া সোজা গ্রামের দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজ-কর্মচারীর বাড়ীতে জ্বালানের জন্য পূর্ব হইতেই কিছু কাষ্ঠ সংগৃহীত ছিল। যখন মহাত্মা সদাশিব মাথার কাষ্ঠের বোঝা নামাইয়া ঐ সঞ্চিত কাঠের উপর রাখিলেন সাথে সাথে উহা দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সমস্ত কাষ্ঠ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়াগেল। সাধু নিজের অপরিসীম আনন্দের উন্মাদনায় আপন পথ ধরিয়া চলিলেন। কাষ্ঠের বোঝা বহনেও দুঃখ নাই এবং উহা পুড়িয়া ছাই হওয়াতেও প্রতিশোধের আনন্দ নাই। কারণ মহাপুরুষেরা রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থান করেন। তাঁহাদের মন সর্বদা ভগবৎ-চিন্তায়ই ভরপূর। এই সব ক্ষুদ্রভাবের স্থান কোথায়? সাধু মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের

প্রত্যেক ব্যবহারে পূর্ণতয়া সাবধান থাকা উচিত যাহাতে তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ না হয়। মহতের প্রতি ক্ষুদ্র অপরাধে মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়।

মহাত্মাগণ সকলের প্রসন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। নিজ অনুগত ও আশ্রিত জনকে সন্তোষ প্রদান করিয়া স্বয়ং সন্তুষ্ট হন, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। তাঁহারা অপরকে প্রসন্ন করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। লোকসেবাকে তাঁহারা ভগবৎসেবা মনে করেন। সর্বভূতে তাঁহাদের ভগবৎদৃষ্টি। সব রূপই শ্রীভগবানের রূপ এবং সব নামই তাঁহার নাম।

একদিন যোগিরাজ মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র নিজের গভীর ভাবের তন্ময়তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কয়েকটি ছোট ছোট কোমল মতি সরলস্বভাব বালক তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তিনিও তাহাদের সহিত শিশুর মত সরল ব্যবহারে তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। বালকরা সকলে মিলিয়া আবদার করিয়া বলিল, "মহারাজ! মাতুরায় আজ ভগবান্ সুন্দরনাথের বড়ই সুন্দর শৃঙ্গার হইবে। আমরা মহেশ্বরের দর্শন করিব। আমাদের তথায় নিয়া চলুন।" বালকদের আন্তরিক আগ্রহ ও নাছোড়বান্দা ভাবের কাছে মহাত্মাকে হার মানিতে হইল। মাতুরা ঐ স্থান হইতে বহু দূরে। তিনি বালকদের খেলার ছলে কাহাকেও কাঁধে এবং কাহাকেও কাঁখে বা বগলে লইয়া তাহাদের চোখ বুজিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, কারণ তখন তিনি মৌন। এইভাবে বালকগণকে লইয়া কৌতুক করিতে করিতে নিমিষের মধ্যে তিনি মাতুরায় পৌঁছিয়াগেলেন। বালকরা বৃষভবাহন মহেশ্বর শ্রীসুন্দরনাথের দর্শন

করিল। মহাত্মা উহাদের প্রসাদ দেওয়াইলেন। শৃঙ্গার মহোৎসব দেখাইয়া যোগিবর সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র যেরূপে উহাদের মাত্বরায় আনিয়াছিলেন সেইরূপে তাহাদের পূর্বস্থানে অর্থাৎ তাহাদের আপন বাসস্থানে পৌঁছাইয়াদিলেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যোগিনী চিত্রলেখা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনুরুদ্ধকে নিদ্রিতাবস্থায় পালঙ্ক সহিত দ্বারকাপুরী হইতে বাণরাজার কন্যা উষার নিকট শূন্যমার্গে অতি সন্তর্পণে শোণিতপুরে লইয়াগিয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও এমন যোগশক্তিসম্পন্না মহাযোগিনী আছেন যিনি পালঙ্কোপরি শয্যায় শয়ন করিয়া লোকান্তর হইতে আকাশপথে ঘুরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর যোগৈশ্বর্য বা বিভূতির কথা একটু এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে। গত ইংরাজী ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের গরমের সময় তিনি সোলন যান। সোলন শিমলা পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। ইহা শিমলা হইতে ত্রিশ মাইল নিম্নে এবং কাল্‌কা হইতে অনুমান পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ মাইল উপরে। সোলন-নরেশ শ্রীতুর্গা সিংজী অতি আস্তিক ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং শ্রীশ্রীমায়ের একজন অতি পুরাতন ও একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার ইষ্টদেবীর ন্যায় সম্মান করেন। তিনি তাঁহার রাজমহলের অতি সন্নিকটে তাঁহার অবস্থানের জন্য পাকাপাকি সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে গ্রীষ্মকালে আমরা অনেকেই সেই শৈলাবাসে গিয়াছি। বলা বাহুল্য সর্বপ্রকার থাকিবার এবং আহারের ব্যবস্থা রাজাসাহেবই করিতেছেন। পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে আদর করিয়া নাম দিয়াছেন “যোগীভাই”।

একদিনের ঘটনা। শ্রীশ্রীমা মধ্যাহ্নের আহারান্তে তাঁহার নির্দিষ্ট ঘর খানিতে পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করিতেছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহার বিশ্রামের সময় ঘরে কেহই থাকে না। বৈকাল অনুমান পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় মা ঘরের পূর্বদিকের প্রশস্ত লম্বা বারান্দা পায়চারি করিতেছিলেন। এই প্রবন্ধের লেখকও তাঁহার সাথে সাথে হাঁটিতেছিল। তিনি কথায় কথায় আপন খেয়ালে সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আজ যদি বেলা তিনটা আর চারিটার মধ্যে এই শরীরটা (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) যে ঘরে থাকে সে ঘরে তোমরা কেহ যাইতে তাহা হইলে এই শরীরটাকে (নিজের শরীর দেখাইয়া) সেখানে পাইতে না। এমন কি যে খাটে এই শরীরটা শুইয়াছিল, সেই খাট, বিছানা, বালিশ কিছুই দেখিতে পাইতে না।" আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই স্থূল দিব্য শরীরটি লইয়া কোনও স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন।

যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমা তো সূক্ষ্মে এমন কত জায়গায়ই গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার এমন কিছু নাই, কিন্তু এই রক্ত মাংসের দ্বারা নির্মিত স্থূল শরীর কোথায়ও এইভাবে সকলের চোখের অন্তরালে চলিয়া যাইবার সংবাদ আজ প্রথম আমি মায়ের মুখে শুনিলাম।

আমি—আচ্ছা মা! তুমি না হয় তোমার এই অপ্রাকৃত চিন্ময় দিব্য দেহ লইয়া লোকলোকান্তরে গমনাগমন করিতে পার, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই জড় পদার্থ, খাট, পালং, বিছানা, বালিশ ইত্যাদি কেমন করিয়া গেল ?

মা—তোমাদের কি যে বুদ্ধি, এইটুকুও বুঝিতে পার না। এই শরীরটার সঙ্গে যখন পরার কাপড়খানা, গায়ের জামাটা কি চাদর-খানা চলিয়া যাইতে পারে, তখন খাট, পালং, বিছানা, বালিশাদি যাইতে আপত্তি কি? এই শরীরটার (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) সাথে এক সের ওজনের জিনিস যদি যাইতে পারে তখন এক মন ওজনের কি দশ মন ওজনের জিনিস যাইতেই বা বাধা কি? এই শরীরের সংস্পর্শে যাহা যাহা ছিল সবই চলিয়া গিয়াছিল।

উচ্চ কোটির যোগীর সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই শ্রবণ করা যায় যে তিনি স্থূল শরীর লইয়া যত্রতত্র আকাশমার্গে যাতায়াত করেন কিংবা গমন না করিয়াও অন্য স্থানে আবির্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু এই রকম খাট, পালং, বিছানা, বালিশ জড় পদার্থ সমূহ লইয়া যাওয়া-আসার কথা শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে আজ আমি প্রথম শুনিলাম।

যোগসিদ্ধ ব্যক্তির অসীম শক্তি। পরমযোগী এবং ঈশ্বরে কোনও পার্থক্য নাই। লৌহপিণ্ড অগ্নির মধ্যে রাখিলে উহাতে যেমন অনলের সকল গুণ অর্সায় বা আরোপিত হয় তদ্রূপ যোগী ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত বা অভেদ হইবার কারণ ঈশ্বরের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁহাতে অর্থাৎ যোগীতে বর্তায় বা প্রকাশিত হয়। ভগবান্ মহর্ষি শ্রীপতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের সমাধিপাদে বলিয়াছেন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম, বিপাক অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ এবং আশয়

অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল বাসনা হইতে নিত্যমুক্ত বিশেষ পুরুষই ঈশ্বর। পরম জ্ঞানীর পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকে বলিতেছেন "তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন।" হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। শাস্ত্রে যোগীর এতই মহিমা।

দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজযোগীদের মধ্যে মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র অন্যতম। তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে নিরূপিত ব্রহ্মকে আপন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর মহত্বপূর্ণ "ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা" নামের বিবৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্মচিন্তার প্রক্রিয়ার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। আপন শ্রীগুরুচরণের উপর তাঁহার অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। তিনি ব্রহ্মচিন্তনকে স্বীয় গুরুনিষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট ফল মানিতেন। "সিদ্ধান্তকল্পবল্লী"তে সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন—

যদপাঙ্গতঃ প্রবোধো ভবদুঃস্বপ্নাবসানকরঃ।
তমহং পরমশিবেন্দ্রং বন্দে গুরুমখিলতন্ত্রজীবাতুম্ ॥

যাঁহার কৃপাকটাক্ষে সংসাররূপ দুঃস্বপ্নের অন্ত হইয়া যায় ও আত্মসাক্ষাৎকার সহজ ও সুলভ হয় এবং সমস্ত শাস্ত্রের নব জীবন-দাতা অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় মানব অখিল শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম গ্রহণে সমর্থ হয় সেই পরমশিবেন্দ্র শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করিতেছি। তিনি গুরুকৃপাকেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মারূপে চিন্তা করিতেন। তাঁহার "আত্মবিদ্যাবিলাস" গ্রন্থে আপন গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

নিরবধিসংসৃতিনীরধি নিপতিত জনতারণস্ফুরণন্নৌকাম্।
পরমতভেদনঘুটিকাং পরমশিবেন্দ্রার্যপাদুকাং নৌমি॥

সীমাহীন সংসার সাগরে পতিত জনগণকে উদ্ধারকারী দীপ্তি-শালী তরণীস্বরূপ এবং অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ মত সকলকে বিদ্ধ বা পরাভবকারী গুলির ন্যায় শ্রীগুরু পরমশিবেন্দ্রের পাদুকাকে আমি নমস্কার করি।

ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তির সমাপনে তিনি বলিয়াছেন, কোথায় আমি জড়-বুদ্ধি বালক আর কোথায় বেদান্তের এই গহন মার্গ। মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমশিবেন্দ্রের কৃপাবলে আমি বেদান্তের তাৎপর্য অবগত হইয়া উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিদ্বদ্‌বৃন্দ দয়াদৃষ্টিদ্বারা আমার ধৃষ্টতা; প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

জড়ঃক্বাহং বালঃ ক্ব চ গহনবেদান্তসরণি-
স্তথাপ্যাম্নায়ার্থং পরমশিবযোগীন্দ্রকৃপয়া।
বিজানন্ ব্যাখ্যানং ব্যরচয়মহং বেদশিরস-
স্তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ময়ি সদয়দৃষ্ট্যা বুধজনৈঃ॥

"আত্মবিদ্যাবিলাস" মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের অত্যন্ত মৌলিক গ্রন্থ। তিনি বারখানি প্রধান উপনিষদের "দীপিকা" টীকা লিখিয়া-ছেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার "ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা" বৃত্তি একখানি জ্ঞানগর্ভ উপাদেয় বেদান্তের গ্রন্থ। তিনি মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ-সূত্রের উপর "যোগসুধাকর" নামের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন—বড়ই দুঃখের বিষয় উহা বর্তমানে পাওয়া যায় না। তাঁহার গুরু পরম-শিবেন্দ্র উপনিষদসিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রহ্মবাচক শব্দের "বেদান্তনাম-সহস্রব্যাখ্যা" সংকলন করিয়াছিলেন। মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র

এই বিস্তৃত সংকলনকে কেবল ৩৫ শ্লোকে "আত্মানুসন্ধান" নামে সংক্ষিপ্ত করেন। সেই যুগের বেদান্তের অসাধারণ পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিত "বেদান্তসিদ্ধান্তলেশ" সংগ্রহে বেদান্তসিদ্ধান্তরত্নের বিস্তাররূপে একত্রিত করেন। মহাত্মা এই বিরাট গ্রন্থকে ২১০ শ্লোকে "সিদ্ধান্ত-কল্পবল্লী" নামে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা ও বেদান্দশাস্ত্রে প্রবেশ ও পাণ্ডিত্য।

এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে যোগিবর শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র এই পৃথিবীতে ২০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী তিথিতে ভগবতী কাবেরীর পুণ্য তটে করুরের নিকটবর্তী নেরুর নামক স্থানে তিনি মহাসমাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পবিত্র সমাধিক্ষেত্র অত্যন্ত রমণীয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা আমরা মহাত্মা সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের আদর্শ জীবনালেখ্য হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি। সাধারণতঃ এক সন্ন্যাসীজীবনে বিবিদিষু, বিদ্বৎ ও অবধূত—পর পর তিনটি অবস্থা বড় দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমনটি আমরা মহাত্মা যোগিবর শ্রীমৎ সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের জীবনবেদে পাই। একাধারে ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই প্রকার অনুকরণযোগ্য আদর্শ জীবন খুবই দুর্লভ।

মানব-জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হইল আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পূর্ণতালাভ-পূর্বক আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি এবং নিত্যানন্দের রসাস্বাদনরূপ পরম শান্তি। ইহা পাইতে হইলে প্রথম আবশ্যক শ্রীগুরুর কৃপা এবং সাথে সাথে

প্রয়োজন আপ্রাণ চেষ্টা বা পুরুষকাররূপ গুরুনির্দিষ্ট সাধনা। এই দুইটিই আমরা প্রাপ্ত হই ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমযোগী মহাত্মা শ্রীসদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের জীবন-চরিত হইতে। পাখী যেমন দুইটি ডানা ব্যতীত উড়িতে পারে না সেই প্রকার মনুষ্যের ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য চাই অপরিহার্য উপর্যুক্ত উপায় দুইটি অর্থাৎ সাধনা ও গুরু-কৃপা সাধনা কত দিন এবং কি ভাবে করিতে হয় সে সম্বন্ধে পাতঞ্জল যোগ দর্শনে মহর্ষি শ্রীপতঞ্জলি বলিতেছেন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। সমাধিপাদ-১৪। বহুকাল ধরিয়া আদরসহকারে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তখন আর ব্যুত্থানসংস্কার দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয় না। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত সাধনা করিলে তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

———

অজ্ঞাত বনকুসুম

দ্বিতীয় কুসুম

ভক্তিমতী শ্রীমতী কান্‌হ

একটী প্রচলিত কথা আছে গোবরেও পদ্মফুল ফোটে এবং দৈত্য কুলেও পরম ভক্ত প্রহ্লাদ জন্মায়। ইহা কেবল কথার কথাই নহে, আজকালও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মঙ্গলবেঢ়ার প্রসিদ্ধ গণিকা শ্যামা। বহু দূর পর্যন্ত তাহার নিখুঁত সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোকিলকণ্ঠে যখন সে গানের তান ছাড়িত তখন দর্শকবৃন্দ তাহার রূপে এবং শ্রোতাগণ তাহার তানে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত। রাজা, মহারাজা ও ধনীর গৃহেই শ্যামার সর্বদা সাদর নিমন্ত্রণ হইত। সাধারণ মানবেরপক্ষে উহার মধুর সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ বড় হইত না। গান শোনা তো দূরের কথা চোখে দেখাও দুর্লভ ছিল।

শ্যামার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সে দেখিতেছিল সদ্য প্রস্ফুটিত একটি শ্বেত শতদল কমলের ন্যায় সুন্দর এবং স্বভাবও ছিল তাহার অতিশয় মধুর, কোমল ও সরল! সেই লাবণ্যময়ী বালিকার নাম শ্যামা আদর করিয়া রাখিয়া ছিল কান্‌হু। মাতা তাহাকে প্রাণের চাইতেও অধিক ভাল বাসিত। কান্‌হু ছিল শ্যামার নয়ন পুতলী। সরলা কান্‌হু যখন হাসিত, শ্যামার হর্ষোল্লাসের আর সীমা

থাকিত না। অনিমেষ দৃষ্টিতে শ্যামা তাহার লাবণ্যময়ী অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যার মুখপানে চাহিয়া থাকিত এবং স্বর্গের সুখ অনুভব করিত। এক কথায় কান্‌হু ছিল শ্যামার প্রাণ। কন্যাকে না দেখিয়া মাতা এক মুহূর্তও থাকিতে পারিত না।

এখন বালিকা কান্‌হু কৈশোরে পা দিয়াছে। তাহার রূপ দিন দিনই শুক্লপক্ষের চাঁদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও উহার জগতের জ্ঞান কিছুমাত্র হয় নাই। এমন সময় মহারাষ্ট্রের বারকরী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীবিঠ্‌ঠল ভক্তদের মঙ্গলবেঢ়ায় আগমনের সংবাদ তাহার কানে পৌঁছিল। কিশোরী কান্‌হু বৈষ্ণব সাধুদের দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহাদের বেষ-ভূষা, পূজাপাঠ এবং ভজন-কীর্তন তাহার শুদ্ধ পবিত্র মনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিল। বিঠ্‌ঠলভক্তগণ কয়েক দিন তথায় বাস করিয়াছিলেন। কান্‌হু প্রতি দিন ঐ সকল মহাত্মাদের দর্শনে যাইত এবং যত অধিক সময় তাঁহাদের দর্শনের সুযোগ পাইত তাহা বড় ছাড়িত না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহার পূর্বজন্মের লুক্কায়িত শুভ সংস্কার সকল জাগিয়া উঠিল।

বিষ্ণুভক্তদের সদুপদেশদ্বারা সে এত প্রভাবিত হইল যে সে মনে মনে তাহার কেবল জগতের সর্বস্ব যথা ধনরত্নই নহে অধিকন্তু তাহার শরীর-মন-প্রাণাদি ভগবান্ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের চরণে সমর্পণ করিয়া দিল। কান্‌হু একদিন মনে মনে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের মানসিক মূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, হে দয়াল প্রভু! আমি তোমার এবং তুমি আমার। আমার যাহা কিছু আছে সবই তোমার। প্রভু! তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও। হে নাথ! এই অকিঞ্চিৎকর

সংসার হইতে আমায় দেহ-মন-প্রাণ সব কিছু সরাইয়া আমাকে তোমার চরণে তুলিয়া লও। হে দয়াল! আমি যেন তোমা হইতে ভিন্ন আর কিছু না জানি। তুমি আমার ইহকাল পরকালের জীবন-সর্বস্ব হইয়া বিরাজ কর। তুমি যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা, ইহা আমাকে বুঝতে দেও এবং মর্মে মর্মে অনুভব করিতে দেও।

মহাত্মাগণ তথায় কয়েক দিন থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন কারণ কথা আছে "রমতা সাধু ঔর বহতা পানী কভী গন্দা নহী হোতা হ্যায়।" যে সাধু সদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়ান এবং যে জল সর্বদা প্রবাহিত থাকে তাহা কখনও মলিন হয় না। যিনি এক স্থানে বহু দিন অবস্থান করেন তাহার ঐ স্থানের উপর কিংবা সেখানকার লোকের উপর আসক্তি হইতে পারে। ইহা সাধুজীবনের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। বারকরী ভগবৎ-ভক্তদের সঙ্গদ্বারা কান্হুর জীবন শ্রীরঙ্গনাথের ভক্তিতে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাহার জীবনে ঘোর পরিবর্তন দেখাদিল। সে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নানাদি সমাপন করিয়া কপালে চন্দনের তিলককরতঃ এবং পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্ শ্রীপাণ্ডু-রঙ্গের ধ্যান করিত। ক্রমশঃ উহার ধ্যান এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে সে তিন চারি ঘণ্টা একাসনে বসিয়া আপন প্রিয়তম প্রাণবল্লভের ধ্যানে বাহ্যিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিত। তাহার দুই নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে দেখা যাইত এবং তাহার সরল মুখ খানিতে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুষমা দেখিয়া মনে হইতে সে যেন কোন এক দিব্য ভাবে মগ্ন হইয়া আছে। যাহারা এই আনন্দ কখনও অনুভব করে নাই তাহারা ইহার কল্পনাও করিতে পারিবে না।

কান্হু এখন আর কিশোরী নহে। সে এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। তহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজ যৌবনশ্রীতে পরিপূর্ণের সাথে সাথে সে সম্যক্‌রূপে ভগবান্ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের হইয়া গিয়াছে। তাহার কেবল শরীর, মন ও প্রাণেই নহে, তাহার প্রত্যেকটি রোমে রোমে আজ তাহার প্রেমাস্পদ পাণ্ডুরঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। তাহার আঁখিতে অষ্ট প্রহর আজ পাণ্ডুরঙ্গই বিরাজমান। কখন তিনি ঝুলনে বা দোলনায় দুলিতেছেন, কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা কান্হুর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদ হাসিতে-ছেন। কান্হু এখন আর এক মুহূর্তও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এমন ভাবে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছেন!

মাংসের টুকরা দেখিয়া যেমন শকুনি, চিল ও কাক লোলুপদৃষ্টিতে তাহার উপর ছোঁ মারে তেমনি কান্হু গণিকাকন্যা হইবার কারণ বহু ধনী কামুক পুরুষগণ এখন শ্যামার বাড়ী ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিল। মনুষ্য জীবনের মূল্য ঠিক ঠিক নির্ধারণ করিতে না পারিয়া নরকের দিকে গমনকারী ব্যক্তিদিগের কুচেষ্টায় অত্যন্ত ব্যথিত ও অধীর হইয়া একদিন কান্হু একান্তে তাহার মায়ের চরণ ধরিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,— "মা! তুমি তোমার এই অভাগিনী কন্যার উপর একটু দয়া কর। নরকের ভয়ানক যাতনা হইতে আমাকে রক্ষা কর। এই ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর জীবনটাকে পাপাসক্ত ভগবদ্বিমুখ কামুক ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যতীত করা অপেক্ষা মৃত্যু আমার নিকট অধিক শ্রেয়স্কর। মা! আমি তোমাকে আমার অন্তরের কথা বড় দুঃখে ব্যক্ত করিতেছি। তবলার উপর চাঁটি পড়িতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

এই কথা বলিতে বলিতে কান্হুর বাণী সহসা শোকাবেগে রুদ্ধ হইয়া-গেল। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সে বলিতে লাগিল। 'মা! সারঙ্গীর ধ্বনি তীক্ষ্ণ বল্লমের ন্যায় যাইয়া আমার হৃদয়ের অন্তস্তলকে বিদ্ধ করে। মন্দিরা বাজিতেই আমি ভয়ে কাঁপিতে থাকি। বিলাসী ব্যক্তিদের কটাক্ষে আমি শত শত বৃশ্চিক দংশনের তীব্র বেদনা ও জ্বালা অনুভব করি। শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত ঐ কামাসক্ত দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষদের দেখামাত্রই আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। উহারা আমার নিকট যমদূতের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। মা! তুমি যাহা চাও তাহা আমি করিতে পারিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মেয়ের কান্না দেখিয়া মায়ের চোখও বেদনায় জলে ভরিয়াগেল। শ্যামা আপন প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা কান্হুকে কোলে লইয়া উহার মাথার কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের মধ্যে স্নেহের সহিত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "জীবিকার্জনের কোন উপায় তো চাই। কান্হু! এই পাপী উদরের পূর্তি কি করিয়া হইবে? আমাদের তো এই পথ ছাড়া ভরণ-পোষণের আর কোন উপায় নাই। জানি মা, জগতে কোন এমন রমণী আছে যে তাহার শরীর বিক্রয় করিতে চাহিবে? কিন্তু বাধ্য হইয়া জীবন রক্ষার জন্য আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কখন কটু বিষপান করিতেই হয়। প্রথম প্রথম এই পাপ কার্য করিতে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, বিবেক দংশন করে এবং অন্তরাত্মা ক্ষোভে দুঃখে ছটফট করে, সত্য। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সব অভ্যাস হইয়া যায়। নির্মল মনের সুপ্রবৃত্তি সকল ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায় এবং পরম পবিত্র আত্মা

পাপপঙ্কের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। আমাদের এই কলুষিত ও গর্হিত জীবনের ইহাই ক্রম। পরে দেখিবে কান্‌হু, ইহাই তোমার স্বাভাবিক জীবন হইয়া যাইবে।”

পবিত্র-হৃদয় কান্‌হু গর্ভধারিণীর মুখে এই অপ্রিয় ও অসাধু কথা শুনিয়া দুঃখে, মনস্তাপে ও লজ্জায় মর্মাহত হইয়াগেল। কোন মা যে তাহার কন্যাকে ঘৃণ্য পাপ-জীবন্ যাপন করিবার জন্য এই ভাবে প্রেরণা দিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। সে ক্রোধে ও ক্ষোভে অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে শ্যামাকে বলিতে লাগিল, “জীবিকার্জনের এই ঘৃণিত উপায় পরি-ত্যাগও তো করা যায় মা! দেখ মা! সামান্য পিপিলিকা হইতে মহাকায় গজরাজের পালন পোষণকারী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধি-পতি বিশ্বম্ভর শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ এখনও মরিয়া যান নাই, তিনিই সকলকে জীবনধারণের উপযোগী আহার যোগাইতেছেন। তিনি আমাদেরও আহার দিবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। তিনি বর্তমান থাকিতে আমি এই হলাহল কেন পান করিব? মা! তুমি যদি কিছুতেই না মানো এবং আমাকে এই কদর্য কার্যে লিপ্ত হইতে বল তাহা হইলে তুমি আমাকে আর জীবিত পাইবে না।”

কন্যার এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া শ্যামা কাঁপিয়া উঠল। সে তাহার আপন সরল স্বভাব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির কন্যা কান্‌হুকে ভাল করিয়াই চিনিত। সে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু যাহা একবার বিচার করিয়া নিশ্চয় করিবে তাহা এক চুলও এদিক্-ওদিক্ করিবে না। তথাপি শ্যামা আর একবার কন্যাকে অতিশয় আদরের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিল। সে অতি শান্তভাবে কান্‌হুকে

বলিতে লাগিল, "দেখ কান্‌হু, আমি তোর মা। তোর হিতের জন্য বলিতেছি। তুই যদি এইরূপ জীবন যাপন করিতে না চাস, ভাল কথা। তুই কোন একজন ধনী ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তোর রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া কত ধনকুবের আমার ইশারার প্রতিক্ষায় রোজ আমার নিকট আসা-যাওয়া করিতেছে। তোর এই অঙ্গসৌষ্ঠব, ঢলঢল যৌবনশ্রী আর কত দিন......।"

কান্‌হুর পবিত্র কোমল হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কেহ যেন বিষপূরিত দগ্ধ-তীক্ষ্ণ-লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। সে মরণঘাতী তীব্র বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে চিৎকার করিয়া উঠিল, "রাক্ষসি! তুমি কেন আমাকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল নাই? তুমি কেন আমাকে এইভাবে তিল তিল করিয়া পোড়াইয়া মারিতে চাহিতেছ? মা! তুমি বিশ্বাস কর, আমি কোন রক্ত-মাংস-নির্ম্মিত ব্যক্তির সহিত দৈহিক ঘৃণিত সম্বন্ধ কোন প্রকারেই.........।" কান্‌হু কথা শেষ না করিয়াই উঠিয়া গিয়া নিকটস্থ এক ঘরে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

পরদিন মঙ্গলবেড়ার প্রখ্যাত বারাঙ্গনা শ্যামা যখন তাহার একমাত্র স্নেহের দুলালী নবনীতোপম প্রতিমা কান্‌হুকে তাহার ঘরে পাইল না তখন তাহার দুই চোখে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বহু খোঁজ খবর করিয়াও যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সে দুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে মনে করিল তাহার স্নেহের কান্‌হু তবে আর বাঁচিয়া নাই। তাহার আহার নাই,

নিদ্রা নাই, দিন রাত্রি কেবল কান্‌হুর চিন্তায় সে বিহ্বল থাকিত। এখন শ্যামার দিন আর কাটে না!

বেশ কিছু দিন পর তাহার স্নেহের কান্‌হুর সংবাদ পাওয়াগেল সে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের চরণাশ্রয় করিয়াছে। আজ এই সংবাদ পাইয়া শ্যামা অশ্রু মুছিল, তাহা হইলে তাহার স্নেহের কান্‌হু মরে নাই, জীবিত আছে।

এতদিন পর আজ কান্‌হুর মুখে প্রসন্নতার হাসি দেখা যাইতেছে। সে আপন প্রাণনাথ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের চরণে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিয়াছে। তাহার জীবন-সর্বস্ব এবং প্রাণ-নিধি শ্রীপাণ্ডুরঙ্গকে আজ সে প্রাপ্ত হইয়াছে। জগতের কোন ব্যক্তির কি বস্তুর কামনা তাহার মনে এক মুহূর্তের জন্যও জাগে না। এমন কি তাহার গর্ভধারিণী শ্যামার কথাও কখন স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে না। সে তাহার প্রিয়তম শ্রীপাণ্ডুরঙ্গকে পাইয়া সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থার এখন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সংসারে একমাত্র গর্ভধারিণী মা ছিলেন তাহারও বন্ধন সে জন্মের মত ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে। এখন সে আর পাণ্ডুরঙ্গ এবং পাণ্ডুরঙ্গ আর সে। এখন এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান করিতে আর কোন ব্যক্তি বা বস্তু নাই। সর্বদা কান্‌হু শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের চিন্তায় স্বীয় মনকে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে। সে এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই শয্যাত্যাগান্তে স্নানাদি সমাপন করিয়া শুচি হইয়া শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতির পূর্বেই মন্দিরে যাইয়া ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে স্বীয় প্রাণবল্লভকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকে। চোখের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যায়।

কান্হু পাষাণে গড়া প্রতিমার মত নিশ্চলভাবে চক্ষু শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের মুখেরপানে স্থির রাখিয়া তাহার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে। প্রাণাধার প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া কান্হুর আর আশ মেটে না। এই ভাবে ভাবিত হইয়াই বৈষ্ণব ভাবুক-কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—

জনম অবধি হাম ওরূপ নিহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ জনম হিয়া হিয়া রাখিনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥

শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পঞ্চামৃতদ্বারা স্নান হইয়া থাকে। মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী কান্হুকে ঠাকুরের চরণামৃত রোজই দেন, তাহাতেই সে সারাদিন অতিবাহিত করিয়া দেয়। রাত্রিতে আরতির পর বিগ্রহের শয়ন দিয়া যখন পূজারী মন্দিরের দরজা বন্ধ করেন তখন সে পুনরায় তাহার প্রাণবল্লভকে দিনের শেষ-প্রণাম নিবেদন করিয়া নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। মন্দির হইতে আসিবার সময় পথে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে দুইখানি শুকনা বাজরার রুটি ও একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আনে। তাহা খাইয়া জলপান করে। তাহার পর আপন প্রিয়তমকে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে। দৈনিক তিন চারি ঘণ্টার বেশী আর সে ঘুমায় না। স্বপ্নেও কান্হু তাহার প্রাণ-বল্লভ পাণ্ডুরঙ্গকেই অধিক প্রগাঢ়ভাবে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে রজনী শেষ করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত মন্দিরে প্রাণের ঠাকুর শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের সম্মুখে ভাবে তন্ময় হইয়া অতিবাহিত করা ছিল ভক্তিমতী কান্হুর দৈনন্দিন কার্যক্রম। তাহার তপস্যা, তাহার সাধনা, তাহার প্রেমবিহ্বলভাব নির্বিঘ্নে বেশ ধারাবাহিকরূপে চলিতেছিল। তাহার শরীর, মন, প্রাণ, এমন কি তাহার প্রতি রোমকূপে পাণ্ডুরঙ্গ এখন অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন। তাহার মুখে এমন একটি সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে দর্শকমাত্রেরই মনে স্বাভাবিক ভাবে জাগিয়া উঠে যে কান্হু তাহার আরাধ্য প্রাণনাথের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। যেমন কাঁচপোকা ভ্রমরকে তীব্র চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমর হইয়া যায় তেমনি কান্হু আজ পাণ্ডুরঙ্গের ধ্যান করিতে করিতে পাণ্ডুরঙ্গময় হইয়া গিয়াছে। কঠোর তপস্যা, আহারের অল্পতা এবং কৃচ্ছসাধনের কারণ উহার শরীর খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উহার সরল পবিত্র মুখাকৃতি যেন দিন দিনই অধিক দীপ্তিময়ী ও ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। দিব্য আনন্দে আজ কান্হু ভরপূর।

লীলাময় শ্রীভগবানের লীলা বিচিত্র। প্রভুর অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় লীলা হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের পক্ষে অসাধ্যই নয় বরং অসম্ভব। তিনি তাঁহার বিধি অনুসারে কখন কখন আপন ভক্তদের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এমন পরিস্থিতি উৎপন্ন করিয়া থাকেন যে সাধারণ মানব তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় এত দুঃখ, কষ্ট ও কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত আপন প্রাণারাম প্রভুর প্রীতির অতিরিক্ত আর কিছুই অভিলাষ করে না এবং ধৈর্যও হারায় না। এই জগতের বড় হইতে বড় প্রলোভনও তাহাকে কোন

প্রকারে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য সে প্রভুর প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্য স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করিতে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

সেই কঠোর পরীক্ষার দিন কান্‌হুর উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অমিত রূপ লবণ্যের প্রশংসা বাদশাহ বেদারশাহর নিকট গোপন রহিল না। সে কান্‌হুর অনুপম সৌন্দর্যরূপ অগ্নিশিখার সম্মুখে শলভ হইয়া পড়িয়াছে। কান্‌হুকে যে কোন প্রকারেই হউক বেদারের চাই। তাহাকে বাদশাহর নিকট লইয়া যাইবার জন্য দুই জন সশস্ত্র সৈনিক মঙ্গলবেঢ়ায় যাইয়া উপস্থিত হইল। শ্যামা দেহোপজীবিনীর বাড়ীতে কান্‌হুকে না পাইয়া সৈনিকদ্বয় অন্বেষণ করিতে করিতে পণ্ঢরপুর আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল। সে তখন তাহার প্রিয়তম পাণ্ডুরঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন। তাহাকে দেখিয়া সৈনিক দুই জন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আর তোমাকে অনাহারে, মলিন বেশ ধারণ করিয়া মন্দিরে মন্দিরে খাইবার জন্য ভিক্ষা করিতে হইবে না। বাদশাহর সুনজরে পড়িয়াছ। এখন তুমি বাদশাহ বেদারের বেগম হইবে। আর চিন্তা কি? কত দাস দাসী তোমার সেবা করিবে। বাদশাহ স্বয়ং তোমার কথায় উঠিবে, তোমার কথায় বসিবে। চল, পালকি প্রস্তুত। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য বাদশাহ আমাদের উপর হুকুম জারী করিয়াছেন।"

কান্‌হু এই ভীষণ পরিস্থিতিতে পড়িয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। যে কামুকদের কুদৃষ্টি এড়াইবার জন্য মাতার পক্ষপুট পরিত্যাগ করিয়া এতদূর পণ্ঢরপুরে পাণ্ডুরঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করা, সেই মাংসলোলুপ গৃধ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখানেও আসিয়া পড়িয়াছে।

এই উৎকট তপোময় জীবনেও এত কঠিন পরীক্ষা! ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কান্‌হু ভাবিয়াছিল মঙ্গলবেঢ়ায় শ্যামার কাছ হইতে সরিয়া পাণ্ডুরঙ্গের নিকট পণ্ঢরপুরে আসিয়া সে এখন নিরাপদ ও সুরক্ষিত। কিন্তু শ্রীভগবান্ কেন যে কি করেন তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। সে বাঁচিবার অন্য কোন পথ আর না দেখিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এই পণ্ঢরপুর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সে যাইবে না। সে বিচার করিয়া মুহূর্তের মধ্যে স্থির করিল, "নিশ্চয়ই আমার শেষ সময় অতি নিকট। আমি আমার এই ভগবানে অর্পিত দেহ কোন হীন ভোগাসক্ত বিলাসীকে বিক্রয় করিতে পারিব না। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার নিকট অধিক শ্রেয়ঃ!"

অতি কাতরভাবে কান্‌হু সৈনিকদের বলিল, "আপনাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব আপনারা দয়া করিয়া আমাকে একবার শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের শেষ দর্শন করিতে অনুমতি প্রদান করুন!"

এই কাতোরক্তি শুনিয়াও তাহাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। একজন সৈনিক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে টানিতে টানিতে উত্তর দিল, "তোমাকে খুঁজিতে আমাদের কতই না কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন সোজা বাদশাহর নিকট চল। আর তোমাকে ছাড়া হইবে না।"

কান্‌হু অশ্রুবিগলিত নেত্রে বিলাপ করিতে করিতে উহাদের বলিল, "আপনাদের নিকট আমার অন্তিম প্রার্থনা। কেবল একবার আমাকে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের দর্শন... ...।" এই কথা শেষ না করিতেই

দ্বিতীয় সৈনিকের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদয় হইল। সে বলিল, "আচ্ছা, ইহাকে দর্শন করিতে দেও। মন্দিরের বাহিরে আসামাত্রই আমরা ইহাকে ধরিয়া ফেলিব। আমাদের কবলে যখন আসিয়াছে, যাইবে কোথায় ?" পরিশেষে উভয় সৈনিক পরামর্শ করিয়া উহাকে মন্দিরে যাইয়া ঠাকুর দর্শনের অনুমতি দিল।

জলহীন মীনের মত কানৃহু ছটফট করিতে করিতে আপন জীবন-সর্বস্ব ভগবান্ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের সম্মুখে যাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তারপর উঠিয়া হাতজোড় করিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে আমার জীবনবল্লভ ! হে আমার জীবনসর্বস্ব !! এই সংসারে আমি তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও চাহিনা। হে আমার ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র স্বামি !!! যে বিপদ হইতে ব্যাকুল হইয়া আমি আমার গর্ভধারিণী জননীকে ছাড়িয়া এখানে তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম, সেই বিপদই আবার আমার কপালে এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে। কামুক বাদশাহর কামতৃষ্ণা শান্ত করিবার জন্য আমাকে তাহার নিকট পৌঁছাইবার জন্য উহার যমদূতের ন্যায় সশস্ত্র সৈনিকরা মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। হে প্রভো ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোন প্রকারেই বাঁচিতে পারিব না। প্রাণ বিসর্জন করিব তাহাও ভাল তথাপি কোন ভোগলোলুপ মানবের কুতসিৎ দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিব না। তোমার এই অধম সেবিকার রক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার উপর। তুমি আমাকে এই নিদারুণ বিপদ হইতে রক্ষা কর। হে আমার প্রিয় ! তুমি তোমার এই অভাগিনী, অকিঞ্চন, অসহায় দাসীকে এই আসন্ন আপদ হইতে উদ্ধার কর, বাঁচাও। দুর্বৃত্ত বাদশাহ বেদার যেন তোমাকে উৎসর্গীকৃত এই শরীর স্পর্শ

করিতে না পারে। তাহার পূর্বে যেন প্রাণ এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। প্রভো! তোমার শ্রীচরণে কান্‌হুর এই অন্তিম প্রার্থনা।"

কান্‌হু পুনরায় তাহার প্রিয়তম শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের চরণে আত্ম-নিবেদনকরতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আর উঠিল না। দেখা গেল উহার শরীর হইতে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া প্রাণের ঠাকুর শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের পবিত্র বিগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সাথে সাথে তাহার দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িল।

বাদশাহর সৈনিকদ্বয় এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া একেবারে হতভম্ভ হইয়া অবনত মস্তকে লজ্জায় ঐ স্থান ত্যাগ করিল উহারা মনে মনে ভক্তিমতী কান্‌হুর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার প্রশংসা করিতে করিতে বাদশাহ বেদারশাহর নিকট যাইয়া সব ঘটনা বর্ণন করিল। ধরা পাখি উড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহার দুঃখের আর সীমা রহিল না।

দৈহিক মিলনে—শরীরের সহিত শরীরের মিলনে বাহির হইতে নানা প্রকারের বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যে মিলনে কেহ, কখন, কোন রকমের প্রতিবন্ধ আনয়ন করিতে পারে না, ভক্তিমতী কান্‌হু আজ তাহার প্রিয়তম শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের সহিত সেইরূপ নিরবছিন্ন ভাবে মিলিত হইয়া অসীম নিত্য মিলনসুখের অধিকারী হইল।

অজ্ঞাত বনকুসুম

তৃতীয় কুসুম

ভক্তিমতী পতিতা শ্রীমতী মাধুরী

শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, কুল, শীল, বিত্তাদি কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। চাই কেবল নিষ্কপট প্রেম বা ভালবাসা। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই—অভাব কেবল ভক্তের প্রেমাশ্রুর। এক বিন্দু চোখের জলে তাঁহাকে যেমন আকর্ষণ করা যায়, আর কিছুতেই তাঁহাকে তেমন করা যায় না।

বহুদিনের পুরাতন একটি ঘটনা। দক্ষিণ ভারতে একজন নৃত্য-গীত-বিশারদ অতিশয় রূপবতী বারাঙ্গনা বাস করিত। তাহার নাম ছিল মাধুরী। তাহার নাচ-গানের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাকে ধনীরা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত এবং বড়বড় মজলিস বা গানের আসরে তাহার নৃত্য-গীতে তৃপ্ত হইয়া বহু অর্থ প্রদান করিত। তাহার সঙ্গীতবিদ্যা, নৃত্যকলা, সৌন্দর্য, খ্যাতি এবং বিপুল বৈভব থাকা সত্ত্বেও মাধুরী কিন্তু সুখী ছিল না। সর্বদাই তাহার হৃদয়ে ভয়ঙ্কর দুঃখের তুষানল ধিকিধিকি জ্বলিত এবং তিল তিল করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিত। অশান্তির

জ্বালায় সে সদাই ব্যাকুল থাকিত কিন্তু তাহার মর্মবেদনার কারণ সে কখন কাহাকেও মুখফুটিয়া বলিত না বা বলিতে পারিত না। তাহার অন্তরের লুক্কায়িত যাতনা সেই কেবল জানিত আর জানিতেন তাহার অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্। এই মর্মান্তিক দুঃখানল বক্ষে ধারণ করিয়াও সে অপরের মনোরঞ্জন করিত। সে জীবনে কাহাকেও ভালবাসিয়া আপন করিতে পারে নাই। তাই মাধুরীর হৃদয়ের নিভৃত এক কোণে না জানি কাহার জন্য এক শূণ্য আসন পড়িয়াছিল।

সে গণিকা হইয়াও অজ্ঞাত কোন লুক্কায়িত শুভ সংস্কারবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিত, এই রূপ, এই ধনসম্পত্তি এবং এই সঙ্গীতবিদ্যা সবই তো দুই দিনের। কবে যে এই সকল শেষ হইয়া যাইবে, তাহা কে জানে? জীবনের পশ্চাতে যমরাজ তাঁহার দণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জানা নাই কোন মুহূর্তে এই সব বৈভব, রূপ লাবণ্য, সঙ্গীতবিদ্যা, নৃত্যকলা প্রভৃতি ধূলায় মিশিয়া যাইবে। এই দুর্লভ ও মূল্যবান মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া ইহার কি সদোপযোগ করা হইল? মৃত্যুর পরে পুনরায় মাতৃ গর্ভের ভীষণ যাতনা ভোগ এবং আবার কষ্টদায়ক মৃত্যু। এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য আমি কি করিলাম? সারা জীবন ভোগবিলাসে, ধনসংগ্রহে ও লম্পটদের মনোরঞ্জনেই কাটিয়া গেল। পরলোকের পাথেয় তো কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিলাম না বরং নরকের দ্বারের সমীপে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া অগ্রসরই হইতেছি। এই সকল চিন্তা মাধুরীর মনকে তোলপাড় করিতে এবং সে একান্তে বসিয়া অব্যক্ত যাতনায় অশ্রু বিসর্জন করিত। কিন্তু মনের এই সব গোপন ভাব সে কখনও কাহারও নিকট ব্যক্ত করিত না হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই গুপ্ত রাখিত।

একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, তাহার সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে এক অপূর্বভাব লুক্কায়িত থাকিত। যে সব সঙ্গীত সে গান করিত তাহার সবই শ্রীরঙ্গনাথের মনোহর সৌন্দর্য ও করুণার ভাবে পূর্ণ থাকিত। সে যখন নৃত্য করিত তখন মনে হইত কোন ভাবুক শ্রদ্ধালু উপাসিকা আপন আরাধ্য দেবতার প্রীতির নিমিত্ত তন্ময় হইয়া যেন পূজার উপচার সকল নিবেদন করিতেছে এবং আপন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটি যেন স্বীয় প্রিয়তমের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান করিতেছে। নৃত্য-গীতের পর দেখা যাইত সে যেন সর্বতোভাবে নিজেকে আপন প্রাণবল্লভের চরণে সমর্পণ করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াগিয়াছে এবং সাথে সাথে সে শান্ত ও জগতের যাবতীয় বিষয় হইতে একেবারে উদাসীন হইয়া যাইত। কাহারও সহিত সে কোন প্রকার ব্যবহার বা বাক্যালাপ করিত না। তাহার এই ভাববিভোর অবস্থা দেখিয়া দর্শক ও শ্রোতাগণ ধীরে ধীরে নীরবে স্থান ত্যাগ করিত। কেহ তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস পর্যন্ত করিত না। এমনই সে অতিশয় গম্ভীর ও ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া যাইত।

বারবনিতা মাধুরী তাহার বাসস্থানের দরজার সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল। কিছু সময়ের মধ্যে উহা একটি বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়। উহার সঘন পত্রাবলীর দ্বারা ঐ স্থানটি আচ্ছাদিত হওয়ায় উহা খুবই শীতল ও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। বৃক্ষের চতুর্দিকে মাধুরী একটি বিস্তৃত পাকা চাতাল নির্মাণ করাইয়া দেয়। সে প্রতিদিন সকালে উঠিয়া চত্বরটি স্বয়ং নিজের হাতে ঝাড়ুদিয়া এবং জলদ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত এবং নিত্য

অশ্বত্থবৃক্ষে জল দিত। স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা বৃক্ষরূপ নারায়ণের পূজা, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিত। গণিকাদের কোন দেবমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ তাই মাধুরী এইভাবে দেবপূজা করিত। সে কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিল অশ্বত্থবৃক্ষে নারায়ণ বাস করেন, সেইজন্য শ্রীভগবান্ গীতায় নিজের মুখে বলিয়াছেন সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থগাছ আমি। সকল কাজ কর্মের মধ্যে ইহাও তাহার একটি বিশেষ নিত্য ক্রিয়া ছিল। এই অনুষ্ঠানে কখন সে অবহেলা বা আলস্য করিত না।

একদিন যখন সে নগর হইতে নৃত্যগীতের পর নিজের বাসস্থানে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরিতেছিল তখন সে অশ্বত্থবৃক্ষের চারিদিকের দৃশ্য অবলোকন করিয়া আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়াগেল। তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং চোখ জলে ভরিয়াগেল। অশ্বত্থগাছের তলায় অন্যান্য দিন দুপুরবেলা রোদের সময় পথিকরা বিশ্রাম করিত। আজ দেখাগেল কয়েকজন বৈষ্ণব মহাত্মা তাঁহাদের বাসস্থান কাপড় দ্বারা নির্মাণ করিয়া লইয়াছেন। চত্বরের একদিকে বৈষ্ণব সাধুদের ধুনি জ্বলিতেছে, অপর দিকে কেহ তিলকসেবা করিতেছেন, কেহ পূজার জন্য চন্দন ঘষিতেছেন, কেহ পুষ্পপাত্র সাজাইতেছেন, কেহ করুণাময় শ্রীভগবানের বিধিপূর্বক পূজা করিতেছেন, কেহ মালা জপ করিতেছেন আবার কেহ বা গীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করিতেছেন। মাধুরী এই অভাবনীয় পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে স্বপ্নেও কখন কল্পনা করিতে পারে নাই যে তাহার মতন পাপিনীর নির্মিত চাতালে মহাত্মারা এইরূপে সাধন, ভজন, জপ ও পাঠের জন্য স্থান মনোনীত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ

করিবেন এবং স্থানটিকে পবিত্র করিবেন। সে মনে মনে মহাত্মাদের চরণে এবং শ্রীভগবান্‌কে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রণামকরতঃ, কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, তাই অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার মনে কেবলই ভয় হইতেছিল পাছে সাধুরা এই নটিনীর যথার্থ পরিচয় অবগত হন। তাহা হইলে হয় তো পবিত্র চলায়মানতীর্থ মহাত্মাগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তীর্থ তো এক স্থানে থাকিয়া মানবকে পবিত্র করে কিন্তু মহাত্মাগণ নানা দেশ ভ্রমণকরতঃ তথাকার লোকদের পবিত্র ও ধন্য করিয়া থাকেন। সেইজন্য সাধুদের জঙ্গম বা গতিশীল তীর্থ বলা হয়।

মাধুরী আর কালাতিপাত না করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার দোতলার ঘরে প্রবেশ করিয়া জানালার একখানি পাট খুলিয়া সেখান হইতে সাধুদের ভজন, পূজন, জপ, পাঠাদি অতি আগ্রহ ও প্রীতির সহিত দর্শন করিতে লাগিল। অশ্বত্থগাছের গোড়ায় এক সিংহাসনের উপর লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণের চতুর্ভূজ একখানি সুন্দর বিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন। ঠাকুরের গলায় তুলসীর মালা এবং চরণের উপর কয়েকটি সুগন্ধ বেলাফুল শোভা পাইতে-ছিল। বিগ্রহের সম্মুখে একখানি ধুনুচিতে সুগন্ধ ধূপ, গুগ্‌গুল ও চন্দনগুড়া জ্বলিয়া স্থানটি ধূমে আমোদিত ও পবিত্র হইয়াছিল। একজন বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেবতার আরতি করিতেছিলেন। এই অতি পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া নৃত্য-গীতে নিপুণা মাধুরীর ইচ্ছা হইতেছিল সেও ঐ সকল সাধুদের মধ্যে যাইয়া

শ্রীভগবানের বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য এবং তাঁহার সঙ্গীতদ্বারা স্তুতি করে। কিন্তু ভয় হইতেছিল যদি সাধুরা তাহাকে পতিতা জানিয়া সেই স্থান ত্যাগকরতঃ অন্যত্র চলিয়া যান। তাহা হইলে সে এই সাত্ত্বিক ও পবিত্র আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। মাধুরী তাহার ঘর হইতে মহাত্মাদের এই সকল ক্রিয়াকলাপ দেখিতেছিল এবং নিজের অতীত জীবন স্মরণ করিয়া সে একাকিনী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার দুই নেত্র হইতে কোন এক অব্যক্ত বেদনায় অশ্রুপাত হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে কয়েকটি শব্দ ভাবের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ নির্গত হইল, "হে করুণাময় প্রভো! তুমি আমার প্রতি একটু করুণা কর। এই ঘোর পাপিনীকে তোমার চরণে আশ্রয় দেও, প্রভো। আর এই কলুষিত জীবনের ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

আরতি সমাপন করিবার পর মহাত্মা দেবতার উদ্দেশ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি উপস্থিত সকল সাধুদের নারায়ণের চরণামৃত বিতরণ করিবার জন্য যেই পিছন ফিরিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইলেন একখানা রজত নির্মিত থালায় সুবর্ণ মুদ্রা ঝক্‌মক্ করিতেছে।

বৃদ্ধসাধু সম্মুখে একটি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা অতি লাবণ্যময়ী সুন্দরী মহিলাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে? তুমি কোথায় থাক? তোমার নাম কি?"

সে দুই হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, বাবা! আমি অধম নারী। আপনার পতিতা কন্যা। "বাবা! আমি শুনিয়াছি, শ্রীভগবানের ভক্তের দর্শন ও প্রণামে সর্ববিধ পাপ ধুইয়া যায়। এই বাক্যে

বিশ্বাস করিয়াই এই অধম পতিতা হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার চরণে প্রণ্যম করিতে সাহস করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আপনার কন্যার অপরাধ ক্ষমা করুন। বাবা! আপনি কৃপা করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রণামী গ্রহণ করিরা আপনার কন্যাকে কৃতার্থ করুন। আপনার চরণে আমার এই বিনীত নিবেদ।"

অপর একটি অল্প বয়সের সাধু কিঞ্চিৎ ক্রোধিত হইয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত ঝাঁজাইয়া বলিলেন; "তুই তোর স্বর্ণমুদ্রা শীঘ্র এখান হইতে তুলিয়া নে। সাধুদের বেশ্যার অপবিত্র ধন গ্রহণ করিতে নাই। শাস্ত্রের নিষেধ আছে।"

সাধুর মুখে এই প্রকার কর্কশও অপ্রীতিকর বাক্য শুনিয়া, মাধুরী অতিশয় দুঃখের সহিত বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া কহিল, "মহাত্মন্! সত্যই আমি মহানীচ ও অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু সাধুরা তো দয়ালু। তাঁহাদের কৃপায় কত মহাপাতকী উদ্ধার হইয়াগিয়াছে। আমার সেই সৌভাগ্য নাই জানি। কিন্তু দয়াময় প্রভুর দয়া না হইলে আজ আপনারা কৃপা করিয়া এই স্থানে পদার্পণকরতঃ আমাকে দর্শন দিতেন না এবং আমার দ্বার পবিত্র করিতেন না। আপনাদের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমি ধন্য হইয়াছি। আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই অধমের এই সামান্য অর্থ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে, বিশ্বাস করুন, কাল মাতা গোদাবরীর পবিত্র জলে এই শরীর ত্যাগকরতঃ আমি চিরতরে পাপের বোঝা হইতে মুক্ত হইয়া যাইব। আমি নিত্য মাতা গোদাবরীর পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া থাকি। তথাপি কি আমার পূর্বকৃত কলুষ ধৌত হয় নাই।"

যে বৃদ্ধ মহাত্মা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পূজা ও আরতি করিতে-

ছিলেন তিনি স্নেহাসিক্ত মধুর বচনে বলিলেন, "মা! তুমি ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথের জন্য এই অর্থদ্বারা একটি মুকুট তৈয়ার করিয়া দেও। তুমি বড়ই ভাগ্যবতী।"

মাধুরী অত্যন্ত দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "এই পতিতার সামান্য উপহার যখন দয়ালু সাধুই গ্রহণ করিলেন না তখন ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথ ইহা স্বীকার করিবেন, কি করিয়া ইহা আমি আশা করিতে পারি ? সাধু, ভাগবতরা তো কৃপার মূর্তিমান বিগ্রহ। তাঁহারা পরমকারুণিক, শ্রীভগবান্ হইতে পাপীদের উপর তাঁহারা অধিক দয়াদৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রভুর ভক্তরাই যখন ঘৃণায় এই অভাগীর তুচ্ছ ভেট পায়ে ঠেলিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি ইহা কি করিয়া গ্রহণ করিবেন।" গণিকার এই ভক্তি ও মধুর বিনীত বাণীতে সেই বৃদ্ধ মহাত্মার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াগেল। তিনি অতি স্নেহের সহিত তাহাকে কহিলেন, "মা! তুমি যে উপহার দিয়াছ তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সেই জন্যই শ্রীরঙ্গনাথকে মুকুট দিবার জন্য তোমাকে বলা হইয়াছে। তুমি এই স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা ভগবানের একটি সুন্দর মুকুট নির্মাণ করাও।"

বিবেকী সাধুরা এক স্থানে বেশী সময় থাকেন না। তাঁহারা মুকুট তৈয়ারির আদেশ দিয়াই ঐ স্থান ত্যাগকরতঃ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মাধুরী স্বর্ণকার ডাকাইয়া শ্রীরঙ্গনাথজীর জন্য একখানি সুন্দর রত্নখচিত মুকুট নির্মাণের আদেশ দিল। এখন তাহার আর অন্য চিন্তা নাই। দিনরাত মুকুট তৈয়ারির কথা এবং শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন কি না; এই ভাবনাই উহার মনকে

অধিকার করিয়া বসিল। যথাসময়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহুমূল্য রত্নজড়িত মুকুট নির্মিত হইল। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের পূজারীর নিকট এই সংবাদ পাঠান হইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি এখানে আসিয়া মুকুট আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে আমরা শ্রীভগবান্‌কে পরাইয়া দিব।"

পরের দিন মুকুটহাতে গণিকা মাধুরী অতি সঙ্কোচের সহিত মন্দিরের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পূজারী উঁহার স্বাগতার্থে দরজায় পূর্বেই উপস্থিত ছিলেন তিনি অত্যন্ত সম্মানের সহিত বলিলেন, "গত রাত্রিতে প্রভূ শ্রীরঙ্গনাথজী আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন, তিনি তোমার হাতেই মুকুট পরিবেন।"

এই অপ্রত্যাশিত স্বপ্নাদেশ শুনিয়া বারাঙ্গনা মাধুরী চমকিত হইয়া অতি বিনম্রভাবে বলিল, "আমি অধম অপবিত্রা নারী। কি করিয়া আমি শ্রীভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিব? আপনি কি বলিতেছেন? আমি যে পতিতা—অস্পৃশ্যা। মাধুরীর মুখে এই কাতরোক্তি শুনিবার সাথে সাথে পূজারী কহিলেন, "মা। তুমি পরম পবিত্রা। এই জন্যই প্রভু স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন, তিনি তোমার হাত দিয়াই মুকুট পরিবেন। চল, মন্দিরের ভিতরে চল। ভগবান্‌কে মুকুট পরাও। আজ তোমার দর্শনে আমি নিজেকে অতি ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ নিজের মুখে বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধু্রবেস মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অত্যন্ত দুরাচারও যদি অনন্যভাবে আমার ভক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত; যে হেতু, সে ব্যক্তি উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে যে পরমেশ্বরের আরাধনার সমান জগতে আর কিছুই নাই।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

হে পার্থ! যে সকল পাপযোনি (পাপজন্মা) এবং স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণ যে কেহ আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, তাহারাও পরমগতি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।২।৪।১৮

মূর্খ এবং পামর চণ্ডাল, শবর, খস, যবন, কোল ও কিরাৎ প্রভৃতি নীচ জাতিও শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেই পরম পবিত্র এবং ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়া যায়।

ভক্তিমতী মাধুরী পূজারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরমদয়াল শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব মনোহর মূর্তি দৃষ্টি-গোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতে মুকুট লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নাচিতে নাচিতে প্রেম-বিভোর অবস্থায় সে প্রভুর

শ্রীবিগ্রহের নিকট যাইয়া পৌঁছিল। নৃত্যের ভঙ্গির মধ্যে উপহার প্রদানের সাথে সাথে সে নিজেকেও ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিতেছে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইতেছিল। কি আশ্চর্যের বিষয়! আজ দেবতার মস্তকে কোন মুকুট কিংবা অন্য শিরোভূষণ নাই। এমনটি হইতে বড় দেখা যায় না। প্রেমবিহ্বলা মাধুরী মুকুট হস্তে নিয়া শ্রীরঙ্গনাথজীকে পরাইতে গিয়া দেখে, দেববিগ্রহ উচ্চ সিংহাসনের উপর বিরাজমান। তাহার হাত ঠাকুরের মস্তক পর্যন্ত পৌঁছাইতেছে না। সে হতাশ হইয়া পড়িল! তাহার মনে উদয় হইল "আমি পাতকিনী, তাই বুঝি ঠাকুর আমার হাতে মুকুট পরিবেন না।" এই ভাব মাধুরীর মনে উদয় হইবার সাথে সাথে দেখা গেল প্রেমের ঠাকুর পতিত পাবন শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীবিগ্রহের মস্তক সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং ভাববিভোরা মাধুরী তাহার জীবনাধার প্রেমাস্পদের মস্তকে রত্নখচিত মুকুট পরাইয়া দিল। মুকুট ধারণ করিবার পর বিগ্রহ পুনরায় পূর্ব্ববৎ হইয়া গেলেন। মাধুরীর মনের গ্লানি অবগত হইয়াই বুঝি অন্তর্যামী পতিত পাবন প্রেমের ঠাকুর পতিতার ভক্তি উপহার গ্রহণ করিবার জন্যই সহসা মস্তক নোওয়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে মুকুট পরাইয়া মাধুরী ঠাকুরের চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার পর তাহাকে আর মাথা তুলিতে দেখা গেল না। সে তাহার প্রিয়তমের চরণে চির বিশ্রাম লাভ করিয়া তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা হইতে মুক্ত হইয়া গেল।

শ্রীভগবান্‌কে না পাওয়া পর্যন্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না এবং পরম শান্তিলাভও করা যায় না। এই জীবনেই যদি

তাঁহাকে না পাওয়া গেল তাহা হইলে উপনিষদের ভাষায় বলে "মহতি বিনষ্টি"। অতএব তাঁহাকে পাবার জন্য মনুষ্যের সর্বতো-ভাবে চেষ্টা করা উচিত এবং তাঁহার কৃপার জন্য অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকা নিতান্ত কর্তব্য। ইহাতেই মানবজীবনের পরম সার্থকতা লাভ করা সহজ হয়।

অজ্ঞাত বনকুসুম

চতুর্থ কুসুম

শিবভক্ত মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর

মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর একজন উচ্চ শ্রেণীর শিবভক্ত সাধু। তিনি শৈব সিদ্ধান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বান্ বলিয়া সেই সময় জনসাধারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন সেই প্রকারই কার্য করিতেন। শাস্ত্রে মহাত্মার এবং দুরাত্মার যথাক্রমে লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।
মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্॥

যাঁহার মন, বাক্য ও কর্ম একরূপ তিনি মহাত্মা, আর যাহার মনে একরূপ, বাক্যে এবং কর্মে অন্যরূপ তাহাকে দুরাত্মা কহে। মহাত্মা তায়ুমানবর শিবের কৃপায় দেহ ধারণ করিয়া বহু মানবকে ঘোর সংসার সাগর হইতে উদ্ধারকরতঃ মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও দেবাদিদেব মহাদেবের চরণকমলে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবন যে সাধনায় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা বেশ অনুধাবন করা যায়। তিনি একাধারে অসাধারণ জ্ঞানী, তপস্বী ও কবি ছিলেন। তাঁহার ভক্তিমূলক রচনাদ্বারা তাঁহার ভগবৎভক্তি,

শ্রীগুরুদেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, সাধনার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন উচ্চ স্তরের যোগীরূপে তিনি অষ্টাঙ্গ যোগের অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস করিয়াছিলেন। জ্ঞানী হিসাবেও তিনি স্বীয় পবিত্র সাধনপরায়ণ জীবনে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ অর্জন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। স্বল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনি ছিলেন একাধারে একজন ভক্ত, যোগী, কবি ও জ্ঞানী। জ্ঞান ও ভক্তিতে যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই তাহা তিনি আপন জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্বে মহাত্মা তায়ুমানবর তামিলনাড়ু প্রদেশকে স্বীয় উপস্থিতিদ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম এবং ঐহিক লীলা সম্বরণের সময় নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তবে তিনি যে তিরুচিরাপল্লীর শাসক শ্রীবিজয়রঘুনাথ চোকলিঙ্গের সমসাময়িক ছিলেন তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যাইতে পারে। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতে দ্বিতীয় চরণের মধ্যে যে বর্তমান ছিলেন ইহা অনুমান করা অনুচিত হইবে না; কারণ তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিরুচিরাপল্লীর রাজার বিশেষ আগ্রহে পিতার পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের অধিকারীর পদে সুশোভিত ছিলেন। শ্রীবিজয়রঘুনাথের শাসন সময় ১৭০৪ হইতে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে।

তামিলনাড়ু প্রদেশের তান্‌জোর জিলার অন্তর্গত বেদারণ্য নামক স্থানে শ্রীবল্লার কেডিলিয়প্পা পিল্লে নামে এক

শিবভক্ত বাস করিতেন। তাহার পত্নী অতিশয় পতিভক্তি—পরায়ণা ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় এই পিল্লে দম্পতি উভয়েই ছিলেন শিবের পরমভক্ত এবং তাহাদের অদ্ভুত ছিল শিবনিষ্ঠা। এই পিল্লে মহোদয়ের বিদ্যাবত্তা ও কর্মনিপুণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিরুচিরাপল্লীর সুযোগ্য ও গুণগ্রাহী শাসক শ্রীবিজয়রঘুনাথ চোকলিঙ্গ তাহাকে স্বীয় রাজপ্রাসাদের অধিকারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকেডিলিয়প্পা পিল্লে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচিদাম্বরম্‌কে দত্তক পুত্ররূপে স্বীয় বড়ভাইকে দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য স্বামীস্ত্রী দুজনেই দ্বিতীয় পুত্রের জন্য তিরুচিরাপল্লীর আরাধ্যদেবতা ভগবান্ শ্রীতায়ুমানবর অর্থাৎ দক্ষিণা-মূর্তির নিকট নিত্য প্রার্থনা করিতেন। দেবতার অনুগ্রহে তাহাদের দ্বিতীয় পুত্র হইল। তাহারা তাহাদের ইষ্টদেবের নামে পুত্রের নাম তায়ুমানবর রাখিলেন। তায়ুমানবর বাল্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী হইবার দরুন অতি অল্প বয়সেই তামিল ভাষা ও সাহিত্যে নিপুণ হইয়া উঠিল এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়াগেল। শিক্ষা শেষ করিয়া তায়ুমানবর বংশের নিয়মানুসারে কুলগুরুর নিকট হইতে শৈবমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের জীবন চরিত পাঠ করিবার সাথে সাথে শৈব সিদ্ধান্ত মতে আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে তৎপর হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি লোকসমাজে একজন উচ্চ স্তরের কবি ও দার্শনিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীশিবের প্রতি তাহার দিন দিনই শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের উপর বৈরাগ্যের সংস্কার রেখাপাত করিল।

দৈবাং রাজপ্রাসাদ অধিকারী (Palace Controller) কেডিলিয়প্পার (অর্থাৎ শ্রীতায়ুমানবরের পিতার) স্বর্গবাস হওয়ায় সেই রিক্তপদ গ্রহণের জন্য রাজা শ্রীবিজয়রঘুনাথ চোকলিঙ্গ শ্রীতায়ুমানবরকে বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তায়ুমানবর রাজকার্যে কোন প্রকারে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছিলেন না। তিনি রাজাকে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আপনি আমাকে এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখুন"; কিন্তু রাজা শ্রীবিজয়রঘুনাথের তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস থাকায় শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে রাজপ্রাসাদের অধিকারীর পদ স্বীকার করিতেই হইল। তায়ুমানবরের ভগবান্ শ্রীদক্ষিণামূর্তির উপর অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সেই দায়িত্বপূর্ণ পদের সুনাম রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দৈবী সম্পত্তি * শ্রীভগবানের কৃপায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল। একদিন রাজা ও তাহার সভাসদগণ বালুর উপর তায়ুমানবরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহার পদতলে পদ্মরেখা দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত

---

* অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অকাপট্য. প্রাণিগণের প্রতি করুণা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, অদ্রোহ এবং নাতিমানিতা এই ষোলটি গুণকে দৈবী সম্পৎ কহে।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদ দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ গীতা ১৬।২-৩

হইলেন। সকলে বুঝিতে পারিলেন তায়ুমানবর একজন অসাধারণ পুরুষ। রাজ্যের ছোট বড় প্রত্যেক মানবের মনেই যখন তাহার প্রতি সম্মান ও আদরভাব বাড়িতে লাগিল, সাথে সাথ দেখাগেল রাজা বিজয়রঘুনাথের দৃষ্টিতেও তিনি যে একজন অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ, সুযোগ্য এবং কর্মকুশল ব্যক্তি তাহা ধরা পড়ায় তিনিও তাহাকে সুনজরে দেখিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে এত অল্প বয়সে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত স্বর্গীয় পিতার অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুভার কার্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বয়সে তিনি তরুণ, অতিশয় সুন্দর ও তেজস্বী ছিলেন। রাজার রানী মীনাক্ষীদেবী মনে মনে উঁহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাক নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার প্রয়াসও করিতেন কিন্তু তায়ু-মানবর জন্ম হইতেই একজন বৈরাগ্যবান্ ও সংযমী পুরুষ হইবার কারণ রানী বার বারই বিফল মনোরথ হইতেন।

রাজা শ্রীবিজয়রঘুনাথ চোকলিঙ্গ তায়ুমানবরের কর্মতৎপরতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাহাকে একখানা অতি মূল্যবান ও সুন্দর কাশ্মীরী শাল প্রদান করিলেন। প্রাসাদ অধিকারী শ্রীতায়ুমানবর এই কার্যের জন্য রাজাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজার বিশ্বাস ছিল প্রাসাদ অধিকারী এই শালখানা যত্ন করিয়া রক্ষা করিবেন, কিন্তু কার্যানুসারে অনুমান করা গেল তিনি ইহা একখানা উনীবস্ত্র অতি-রিক্ত অপর কিছু মনে করেন নাই এবং ইহার মর্যাদাও বিশেষ কিছু

দেন নাই। রাজপ্রদত্ত শালখানা লইয়া যখন তায়ুমানবর আপনার বাসস্থানে ফিরিতেছিলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন এক গরীব বৃদ্ধা রাজপথের উপর শীতে জড়সড় হইয়া কাঁপিতেছেন। তায়ুমানবরের কোমল হৃদয় এই দৃশ্য দেখিয়া করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি অতি আদরের সহিত আপন মাতার ন্যায় ঐ দরিদ্র শীতার্তা-মহিলার শরীরে শালখানা জড়াইয়া দিলেন। এই কার্যে ঐ দুঃখিনী রমণী শিহরিয়া উঠিলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "এই মূল্যবান শাল আমাদের ন্যায় দরিদ্রের যোগ্য নহে।" এই কথা বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া তায়ুমানবর অতি সম্মানের সহিত বলিলেন, "মা! উপস্থিত ইহার আবশ্যকতা আপনারই অধিক। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করুন, প্রত্যাখান করিবেন না।"

যখন রাজা বিজয়রঘুনাথ জানিতে পারিলেন যে তাহার প্রদত্ত রাজকীয় উপঢৌকন বহুমূল্যের শালখানা তায়ুমানবর একজন অস্পৃশ্যা রাস্তার ভিখারিনী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন; ইহাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি এই কার্যের দ্বারা রাজার উপহারের অসম্মান বলিয়া মনে করিলেন। রাজা তায়ুমানবরকে রাজ-প্রাসাদে হাজির হইবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। তিনি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু নির্ভিক শিবাশ্রিত তায়ুমানবর রাজ্যের একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তার কোপে কিছুমাত্র ভীত ও বিচলিত হইলেন না বরং তিনি অতিশয় স্বাভিমানের সহিত আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজাকে বলিলেন, "আমার দৃষ্টিতে সমস্ত স্ত্রীজাতি ভগবতী জগজ্জননী

পার্বতীস্বরূপ। আমি আপনার অর্পিত শালখানা বিশ্বজননী মহা-মায়াকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছি।" রাজা আপন ব্যবহারে লজ্জিত হইলেন এবং আপন প্রাসাদ অধিকারীর নিকট স্বীয় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তায়ুমানবরের সদগুরু লাভের জন্য প্রবল বুভুক্ষা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র সকল এবং বহু রাজকার্য সম্বন্ধী জটিল সমস্যাদি হইতে তাঁহার মন ক্রমশঃ তিক্ত হইতে ছিল। তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সত্যসাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীশঙ্করের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে ছিল। একদিন তিনি তিরুচিরাপল্লীতে ভগবান্ শ্রীতায়ুমানবর দক্ষিণামূর্তির মন্দিরে দেবতাদর্শনে যাইয়া যখন তিনি মন্দিরের সিঁড়ি উঠিতেছিলেন তখন তিনি এক শৈব রাজ যোগীর দর্শন পাইলেন। তিনি এক শিবমঠের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিরুমূলর শৈব-সম্প্রদায় পরম্পরার মধ্যে সাধু বলিয়া তাঁহার গণনা হইত। তিনি মন্দিরের কোন এ একান্ত স্থানে মৌন হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহা মুখকমল অদ্ভুত দিব্য এক জ্যোতিঃদ্বারা উজ্জ্বল এবং তাঁহার চতুর্দি শান্তির প্রবাহে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একজন প্র যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তায়ুমানবর মহাত্মার দর্শন প্রা হইয়া নিজের ভাগ্যের প্রসংশা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন এবং মৌনগুরুর চরণে অর্পি

শ্রদ্ধা ও মহতিভক্তি নিবেদন করিলেন। তিনি স্বীয় জন্মজন্মান্তরের হৃদয় দেবতা গুরুদেবের চরণে সন্ন্যাস দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গুরু সুযোগ্য এবং প্রকৃত জিজ্ঞাসু বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বেদান্ত এবং শৈব সিদ্ধান্ত. দুইয়েরই গূঢ় রহস্য উপদেশ করিলেন। মৌন গুরু তাহার হৃদয়ের আকূতি দেখিয়া তাহাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের সাথে সাথে কিছু সময় গৃহস্থাশ্রমেই থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং বলিলেন ‘ তোমার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় হইলে আমি নিজেই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। তুমি চিন্তা করিও না. এখন আত্মানুশীলনে লাগিয়া যাও, ভগবান্ শ্রীতায়ুমানবর দক্ষিণামূর্তির উপাসনা কর এবং রাজকার্য অতিশয় দক্ষতার সহিত আরও কিছু সময় সংচালন কর।”

শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত তায়ুমানবর আত্মচিন্তায় দৃঢ়তার সহিত আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণামূর্তির মন্দিরে দেবদর্শনের জন্য গমনকরতঃ আপন জীবন কৃতার্থ ও ধন্য করিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাহার মন লাগিত না এবং জগতের বিষয়সুখেও তাহার অনাসক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুরুদেবের কৃপা স্মরণ করিয়া তাহার ব্যাকুলতা তিনি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ‘‘হে তিরুমূলর সম্প্রদায়ের মৌন গুরু! আপনি যোগসিদ্ধ মন্ত্রদাতা। আপনি আমাকে মৌন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। আপনার এই অধম দাস কি সমস্ত বিষয়সুখের কামনাকে পদদলিত করিয়া চঞ্চল মনরূপী মহাপারাবারের উত্তাল তরঙ্গনিচয়কে আত্মসাৎকরতঃ বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে অনাদি

আত্মজ্ঞান জাগ্রৎ করিয়া জীবন সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে
পারিবে? হে দেব! আপনি আমাকে মদমত্ত হস্তীর তুল
জগতের কামিনীকাঞ্চন এবং বিষয়কে দূরে ফেলিয়া সম্মার্গে চলিবা
জন্য শিক্ষা দিয়াছেন। হে প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া সম্পদ
বিপদে সমান থাকিবার জন্য এবং সুদৃঢ় মৌনব্রত ধারণকরতঃ শা
থাকিবার জন্য দাসকে আদেশ করিয়াছেন। আমি কি আপনা
আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইব? আপনি শক্তি প্রদান ন
করিলে ইহা আমার পক্ষে কদাপি সম্ভব হইবে না।" মৌন গুরু
অনুগ্রহে এখন তিনি সচ্চিদানন্দ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইবার জ
দৃঢ় সংকল্প করিলেন। শ্রীতায়ুমানবর এখন কি করিয়া প্রাসা
অধিকারীর পদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন সেই সুযোগ অন্বেষ
করিতে লাগিলেন।

দৈব সংযোগে কিছুদিন পর রাজা শ্রীবিজয়রঘুনাথ চোকলি
পরলোকে গমন করিলে রানী মীনাক্ষী রাজ্যের সমস্ত শাসন নিজে
হাতে লইলেন। তাহার লোলুপ দৃষ্টি প্রথম হইতেই তরুণ তা
মানবরের সৌন্দর্যের উপর পড়িয়াছিল। রাজার ভয়ে এতদি
পর্যন্ত তিনি তাহার কুঅভিলাষ দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন
এখন অবসর পাইয়া তায়ুমানবরের হৃদয়ের উপর যে কো
প্রকারেই হউক অধিকার জমাইতে চাহিতেছিলেন। তিনি এ
সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র—তাহাকে শাসন করিবার এখন আর কেহ নাই
একদিন রাত্রিতে অত্যন্ত অনুকূল অবসর পাইয়া মহারানী মীনা
তাহার বৈধব্যে তিলাঞ্জলি দিয়া নখ হইতে শিখা পর্যন্ত সর্বা

নানা প্রকার মহামূল্যের জড়োয়া অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিলেন, শরীরে প্রসাধনদ্রব্য মাখিলেন এবং মূল্যবান রেশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাসাদ অধিকারী তায়ুমানবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মীনাক্ষী তাঁহার নিকট স্বীয় অবিহিত কুৎসিত বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য মানমর্যদা বিসর্জন দিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তায়ুমানবর আপন কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে প্রথম হইতেই পূর্ণরূপে সাবধান ছিলেন। তিনি মহারানীর নিকট নিবেদন করিলেম "আপনার স্কন্ধে মহা-রাজার অবর্তমানে এক বিশাল রাজ্যের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। এখন আপনার প্রধান কার্য প্রজারঞ্জন করা। আপনি যেমন আপনার প্রজা সকলের মাতৃতুল্যা, তেমনি আপনি আমারও মাতার সমান এবং আমার সংরক্ষিকা ও অন্নদাত্রী। আপনার ন্যায় একজন সম্মানিতা রাজমহিষীর পক্ষে আমার মতন একজন অধীনস্থ রাজকর্মচারীর নিকট এইরূপ নিন্দিত প্রস্তাব করা উচিত নহে। আপনি আমাকে সন্তানজ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।" কিন্তু মীনাক্ষী স্বীয় মনোরথ পূর্তির জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ও অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তায়ুমানবরকে বলি-লেন, "আমি তোমার প্রভুপত্নী, বর্তমানে স্বামিনী, আমি তোমাকে এই কার্যের জন্য আদেশ করিতেছি। তুমি আমার আজ্ঞা বিনা দ্বিধায় পালন কর।" মহারানী মীনাক্ষী পূর্ণ রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া তায়ুমানবরকে ভীত ও অভিভূতকরতঃ আপনার ভোগবাসনা তৃপ্ত করিবার প্রয়াস করিলেন; কিন্তু তায়ুমানবর

গুরুর কৃপায় বিষয়ভোগকে—এত বড় প্রলোভনকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া আপন সিদ্ধান্তের উপর হিমাচলের সমান অচল, অটল ও দৃ ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যরসের রসিক। তিনি স্বয়ং নিজেকে এব রানীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "অস্থি, মাংস ও রুধিরের দ্বার নির্মিত এই শরীরে সৌন্দর্য্য অতীব নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। জগতে যাবতীয় বিষয়সুখ সবই ক্ষণিক। বিষয়ভোগে আসক্ত হওয়া মানব বন্ধন দশায় পতিত হয়।" তায়ুমানবরকে রাজশক্তি কোন রকমেই ভীত করিতে না পারিয়া হার মানিল। তিনি রানী মীনাক্ষীকে বলিলেন, "আমি সংসারে কাহাকেও ভ করি না। পরম শিবই আমার প্রকৃত প্রভু আমি তাঁহার ইচ্ছার অধীন।" তায়ুমানবরের মুখে এই কথা শুনিয়া রানী নিরাশ হইয়া ফিরিয়াগেলেন। আঘাত-প্রাপ্ত সাপিনীর ন্যা রানী মীনাক্ষী এখন হইতে তায়ুমানবরকে ষড়যন্ত্র করিয়া আশ ভঙ্গের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িলেন।

রানীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বিচারশীল তায়ুমান তিরুচিরাপল্লী পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। কারণ রানী আজ্ঞা অমান্য করিয়া তাহার রাজ্যমধ্যে বাসকরা কোন প্রকারে নিরাপদ নহে। তিনি আপন মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে মন! তুমি সুবর্ণের সমান। যেমন সুবর্ণের দ্বারা নানাপ্রক আভূষণ নির্মিত হয়, ঠিক তেমনি মন তোমার মধ্যে অনেক পদা ভাব, সংকল্প-বিকল্প সব সমাবিষ্ট রহিয়াছে। হে মন! তু আপনাকে সংযত করিয়া কি সমাধিমগ্ন হইতে পার না? তো

হইতে বড় এই সংসারে আমার আপন জন আর কেহ নাই। তুমি তো আমার নিকট সাক্ষাৎ ভগবদনুগ্রহস্বরূপ। তুমি আমার গুরু। তোমার ও আমার, উভয়ে সম্বন্ধ অভেদ।" তিনি মহারানীর কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন।

তিনি অতি সন্তর্পণে তিরুচিরাপল্লী ত্যাগ করিয়া রামেশ্বরাভিমুখে স্বীয় সহকর্মী ও অনুরক্ত শিষ্য অরুল্যয়ের সাথে গমন করিলেন। পথে কিছু সময়ের জন্য রামনাথপুরম্—রামনদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

রামনদের রাজা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তায়ুমানবর রাজার আগ্রহে তাঁহার এক উদ্যানে বাসকরতঃ ভগবান্ শ্রীশিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল তথায় থাকিয়া পরে তিনি রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। রামেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি ভগবতী আদ্যাশক্তির স্তুতি করিলেন এবং মহারানী মীনাক্ষীর ভীষণ কবল হইতে মুক্তি প্রাপ্তি যে পরমেশ্বরীরই অহৈতুকী কৃপায় হইয়াছে তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন। রামেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁহার শিবভক্তির প্রভাব লোকসমক্ষে এই ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে সময় তিনি রামেশ্বরে নিবাস করিতেছিলেন সেই সময় তথায় ভয়ঙ্কর অকাল পড়ে। বর্ষার অভাবে শস্য হওয়া তো দূরের কথা গাছপালা পর্যন্ত শুষ্ক হইতে লাগিল। পশুপক্ষী এবং মনুষ্যের করুণ বেদনায় ও আর্তনাদে তায়ুমানবরের কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাব পরমেশ্বর শিবের নিকট আপন আকুতি জানাইলেন—

(১) যদি শৈবধর্ম মহান ধর্ম হয়,

(২) যদি শৈবগণের আরাধ্য দেবতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের কপালে চন্দ্র শোভিত থাকেন,

(৩) ইন্দ্রিয়গণের বিজয়ের পরিণামস্বরূপ আনন্দ যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে হে মেঘ! মুসলধারে বৃষ্টি কর।

ভগবান্ শ্রীশিবের কৃপায় এবং তায়ুমানবরের সত্যনিষ্ঠার গুণে খুব বর্ষা হইল এবং চরাচর সকলের মধ্যে নবীন প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখা গেল।

তাঁহার বড় ভাই শিবচিদাম্বরম্ তাঁহার রামশ্বর অবস্থানের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার মানসে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত তায়ুমানবরকে তাঁহার জন্মস্থান বেদারণ্যে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ কোন প্রকারেই এড়াইতে পারিলেন না। বিধির বিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। অগত্যা তাঁহাকে বেদারণ্যে আসিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। বিবাহের পর অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পত্নী কনকসভাপতি নামের একটি পুত্রের মুখ অবলোকন করিয়া পরলোক গমন করিলেন। সহধর্মিণীর এত শীঘ্র ইহলোক হইতে গমনকে তায়ুমানবর স্বীয় আধ্যাত্মিক সাধনার পথে শিবের কৃপাই মনে করিলেন। এই আকস্মিক ঘটনা তাঁহার বৈরাগের পথে সহায়ক হইল। মৌন গুরু বহু পূর্বে তায়ুমানবরকে কথা দিয়াছিলেন সময় হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি বেদারণ্যে আগমনকরতঃ তাঁহাকে শিবরাজযোগের দীক্ষা প্রদান করিয়া সন্ন্যাসমার্গের পথিক করিয়া দিলেন। তায়ুমানবর ইহার পর হইতে শিবের আরাধনা করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ-করতঃ সেই সব স্থান পবিত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাব্য-মাধুরী, তপস্যা এবং শান্ত-সংন্যস্ত চিত্ত-বৃত্তি অসংখ্য মানবকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল এবং তাঁহার ভগবংভজন, শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা আপন আপন জীবন ধন্য ও কৃতার্থ করিল। মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর বিভিন্ন শৈবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জনসাধারণকে শিবের উপাসনা—রহস্য বুঝাইতে লাগিলেন এবং পরমশিবই যে সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম এই সিদ্ধান্ত সকলের মধ্যে প্রচার করিলেন।

তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করিবার পর মহাত্মা তায়ুমানবর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রামনাথপুরমের নিকটবর্তী কট্টুরানী নামক স্থানে সময় অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। একজন ধনী সম্ভ্রান্তঘরের মহিলা তাঁহার একান্তবাসের জন্য একটি উদ্যানবাটিকার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং ঐ উদ্যানের মধ্যে একটি অতি সুন্দর জলপূর্ণ সরোবর ছিল। মহাত্মা তায়ুমানবর এই জন-কোলাহল-শূন্য বাগানে থাকিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। সাধনকালীন তাঁহার মর্মস্পর্শী একটি বাণী নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

"জন্ম-জন্মান্তরে আমি জগতের বহুস্থানে বাস করিয়াছি। আমি স্বীয় কর্মের পরিণামস্বরূপ অসংখ্য নাম ও রূপ ধারণ করিয়া জগতের নানা প্রকার বহু সুখ-দুঃখের আস্বাদন করিয়াছি। ইষ্ট-

জ্ঞানে আমি অনেক দেবদেবীর উপাসনা ও কতই মতবাদে
অনুগমনকরতঃ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি। এখন আপ
মনের অসংখ্য চঞ্চল তরঙ্গকে স্বীয় অন্তকরণে সংস্থিত শান্তির অগা
বারিধি এবং মনোমন্দিরের দিব্যতম জ্ঞানজ্যোতিঃ পরমশিবে
আরাধনার অভিমুখে যোজনা করা কর্তব্য।"

তিনি সাধনক্ষেত্রে শৈবসিদ্ধান্তকেই আপন অবিচল নি
বলিয়া জগতের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসি
"শিবজ্ঞানবোধম্" নামের বারটি সূত্রের গদ্যাত্মক গ্রন্থে বিশ্লেষ
করতঃ শৈবসিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন।

শৈবসিদ্ধান্তের প্রবর্তক শ্রীমৈকন্দদেবর ত্রয়োদশ শতা
প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন। এই বিশিষ্ট শৈবসিদ্ধা
প্রবর্তকের উনপঞ্চাশ (৪৯) শিষ্যের মধ্যে শ্রীঅরুলনন্দী শি
চার্য "শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ার" রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তি
শৈবসিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।
সিদ্ধান্তের অনুসারে জগৎ অনাদি এবং সম্পূর্ণ সৎ বলিয়া নিরূপি
হইয়াছে এবং বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তির জন্য শিবের কৃপা অত
আবশ্যক বলা হইয়াছে। আত্মার পরমশিবে অন্তর্ভূক্ত
একীভূত হইয়া যাওয়াই এই সিদ্ধান্ত মতে মুক্তির অন্তিম র
ইহাকে পরামুক্তিও বলা যাইতে পারে। মৈকন্দদেবর জীবন্মু
জন্যও শিবের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী। সর্বপ্র
উপাসনার চরম ও পরম পরিণতিই হইল উপাসকের আ
উপাস্যের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। মহাত্মা তায়ুমানবর

সিদ্ধান্তের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অদ্বৈতবাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এইভাবে তিনি শৈবসিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সমন্বয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থাকে "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমরসনন্নেরী" বলা হয়। ইহার অপর নাম "নন্নোরী সম্মার্গ"। ভগবান্ শ্রীশিবের কৃপা আপন জীবনে অনুভব করিতে থাকাই তাঁহার আচরিত শৈবসিদ্ধান্তের সাধনার প্রাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

মহাত্মা তায়ুমানবর সাধনায় সন্তোষজনক প্রগতিতে মনকে বশে রাখিবার বড় মহত্ত্ব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যে ব্যক্তি মনকে স্বীয় বশে রাখিয়াছেন, তিনি বাস্তবিকই "মহাযোগী"। সন্ন্যাসী হইয়াও যদি সে ইন্দ্রিয়গণের ও মনের বশে হয় এবং বিষয়ভোগে রত থাকে তাহা হইলে সে একটি হস্তিমূর্খ।" সদা সর্বদা এবং সর্বাবস্থাতে নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং আপন অন্তরে পরমশিবকে নিরন্তর অনুভব করা কর্তব্য। ইহাই পরমার্থ লাভের উত্তম মার্গ। শান্তি, সত্য, সরলতা, দয়া, উদারতাদিদ্বারা জীবনকে সমৃদ্ধশালী করাই তায়ু-মানবরের দৃষ্টিতে সাধনার সফলতা।

সাধু তায়ুমানবর মনকে জড় না মানিয়া চেতন মানিয়াছেন। তিনি মনকে শিব হইতে অভিন্ন চিৎশক্তির রূপ বলিয়াছেন। তিনি মনকে মর্মস্পর্শী ভাষায় বুঝাইয়াছেন—"হে মন! আমি বহুদিন পর্যন্ত তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদে ব্যতীত করিয়াছি, কিন্তু এখন হইতে তোমার সঙ্গে বিয়োগ হইতেছে। এই বিয়োগ

দশাতে যদি তুমি আমার নিকট মৃত এবং শক্তিহীন হও
হইলে আমি তোমার এই বিশ্রামের বা বিয়োগাবস্থার অভিন
করিতেছি। তোমাদ্বারাই আমি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব"। তিনি মনের অবাধ ইচ্ছাপূর্তি
চঞ্চলতার প্রতি সাবধান থাকিতেন। মন কখন কখন সাধ
বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে, এই কথা তিনি সর্বদা মনে রাখি
এবং সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। একস্থলে তিনি মনকে স
ধিত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "পাগল হাতী, বন্য ভল্লুক
ভয়ানক হিংস্র বাঘকে বশ করা, সিংহের উপর আরোহণ
অথবা বিষধর সর্পকে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহার সাথে খেলা করা
সহজ ; লৌহাদি ধাতুকে সুবর্ণে পরিবর্তন করা, নির্জন
অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করা, অথবা দেবদেবীকে বশ করাও
সহজ ; সদা স্থির যৌবন রক্ষা করা, পরকায়ায় প্রবেশ করা. জ
উপর গমনাগমন করা, অগ্নির উপর উপবেশন করাও স
কিন্তু মনকে বশে রাখিয়া এবং মৌনব্রত ধারণকরতঃ পর
শিবের চিন্তায় তৎপর থাকা সহজ নহে"।

মহাত্মা তায়ুমানবরের শিবনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং
শ্রেণীর ছিল। হৃদয়ে অবস্থিত পরমশিবের প্রতি তিনি এই
নিবেদন করিয়াছেন—"হে দেব ! আমি আপনার পূজা কি প্র
করিব এবং আপনার সম্মুখে কি ভাবে আমি প্রণাম ক
আপনার পূজার জন্য কি করিয়া আমি নীহারের দ্বারা সু
স্নিগ্ধ পুষ্প চয়ন করিব কারণ ঐ পুষ্পে তো আপনারই নি

কি প্রকারে আমি আপনার সম্মুখে হাত জোড় করিব, কি করিয়া আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব কারণ আপনি তো আমার সম্পূর্ণ দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার সারা অন্তঃকরণে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আমরা যে পূজা করি উহা তো অপূর্ণ পূজা। আপনি অসীম আকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আপনি পরব্রহ্ম পরমাত্মা ওঁকার স্বরূপ, চারিবেদ আপনারই রূপ, আপনি বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং আপনিই সকল প্রাপ্তির মধ্যে পূর্ণপ্রাপ্তি। আপনাকে প্রাপ্ত হইলে আর কিছুই প্রাপ্তব্য থাকে না। আপনি সর্ব দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দর্শন, আপনিই একমাত্র জ্ঞেয়। আপনি সর্বোচ্চ পরমজ্ঞান। আপনি সকল চেতনের মধ্যে মূল চেতন্য। আপনিই অন্তরাত্মা, আপনিই পরম জ্যোতিঃ। আপনিই সকল শব্দ এবং সকল শব্দের অর্থও আপনিই। আপনিই মৌনের প্রত্যক্ষ স্বরূপ এবং আপনিই জ্ঞান সাম্রাজ্যের মধ্যে আনন্দময়ী কৃপার মূল অধিষ্ঠানস্বরূপ।”

তিনি সৌন্দর্য-মাধুর্য-নিধি শিবের সুন্দর মধুর স্বরূপের নিরূপণ করিতে যাইয়া কহিয়াছেন—“হে পরম সুন্দর শিব! আপনার সাক্ষাৎকারের জন্য আমার যাহা কিছু সামান্য সাধনা, শ্রম বা চেষ্টা তাহা তেমনি অতি তুচ্ছ যেমন কোন ব্যক্তির অসীম আকাশকে পূর্ণরূপে দর্শন করিবার জন্য সাধারণ একটি উচ্চস্থানে আরোহণ।” তাঁহার কথার মধ্যে কোন কোন স্থলে মধুর রসের রমণীয় চিত্রের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাযুজ্য মিলনের যে কি আনন্দ তাহা কেহ প্রথমে

ধারণাও করিতে পারে না, যেমন কোন কুমারী কন্যা বিবাহি
জীবনের যে কি মধুর স্বাদ তাহা সে পতি প্রাপ্তির পূর্বে কো
প্রকারেই অনুভব করিতে সক্ষম হয় না।

সাধু শ্রীতায়ুমানবর বিষয় বাসনা-দ্বারাপূর্ণ এই সংসারসা
পার হইবার জন্য তাঁহার জীবনসর্বস্ব শ্রীশিবের নিকট এইভা
প্রার্থনা জানাইয়াছেন—"হে শিব! হে দেব! হে আনন্দস্বরূপ
হে মুক্তিপ্রদ! এই জগতে মানুষের কামনার কোন অন্ত নাই
উহা গণনায় অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাহা
অধিকারে পৃথিবীর সমস্ত ভূমি সে অধিক শক্তিশালী হইবার জ
সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে। কুবেরে
সমান সম্পত্তিশালী ব্যক্তি অধিক ধনের আকাঙ্ক্ষায় রসায়নবি
দ্বারা সাধারণ ধাতুকে সুবর্ণে পরিবর্তিত করিবার জন্য কতই
শ্রম স্বীকার করিতেছে। দীর্ঘায়ু মানব আরও অধিক কাল জীবি
থাকিবার নিমিত্ত জরা-গ্রস্থ জীর্ণ শীর্ণ শরীর কায়াকল্পদ্বারা শ
সম্পন্ন করিতে চাহে। এই সবের অভিপ্রায় কি? যদি একটু স্থি
চিত্তে বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় ইহার তাৎপ
মানব আহার বিহার এবং আনন্দের সহিত নিদ্রায় কালযাপ
করাই জীবনের সার্থকতা মনে করে। হে দেব! হে পরমেশ্ব
আপনার কৃপায় আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতেই আমি সন্তু
আপনি দয়া করিয়া মনকে একাগ্র ও বশে আনিবার শক্তি আমা
প্রদান করুন যাহাতে আমি মিথ্যা অহংকার হইতে নিজেকে মু
করিয়া বিষয়বাসনারূপ মহাসাগরের পরপারে যাইতে সক্ষম হই।

মহাত্মা তায়ুমানবরের রচিত মধুর ভগবদ্বিষয়ক গান এবং ভক্তিরস উদ্দিপক প্রবন্ধ সকল তামিলনাডু প্রদেশে অতিশয় আদরের সহিত গীত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার রচনার মধ্যে জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং বিষয়সুখের নীরসতা স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীশিবকে পাইবার জন্য তিনি সদা বড়ই ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। প্রসিদ্ধি আছে তিনি তাঁহার জীবনে ১৪৫২ খানা ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনার দ্বারা তাঁহার ইষ্ট-দেবতা শিবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। যদি ঐ সব রচনার ভাবগুলি নিয়মপূর্বক মনন করা যায় তাহা হইলে উহাদ্বারা মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং সাধন পথে দিব্য প্রকাশের অবতরণ হয়। তাঁহার লেখার মধ্যে শৈবসিদ্ধান্তের মহত্ত্বের বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি শৈবসিদ্ধান্তের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং উহাকে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনার নাম যথাক্রমে পরাপরক্কন্নি, পৈঙ্গিলিক্কন্নি, এন্নলক্কন্নি এবং আনন্দক্কলিপ্পু। তিনি সংস্কৃত এবং তামিল দুই ভাষারই মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতকাব্য রচনার মধ্যে তামিল ভাষার ভাবমাধুরী এবং জ্ঞান গরিমা এবং তামিল ভাষার রচনার মধ্যে সংস্কৃতের সুন্দর সুন্দর পদবিন্যাস ও ভাব সকল সন্নিবেশিত করিয়া উভয় ভাষাকেই সমৃদ্ধশালী ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন।

মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর শিবতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তত্র সাধনা ও অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরমশিব তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় জ্যোতিরূপ দর্শন দানে

তাঁহার জীবন কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে তিনি শিবের মূর্তরূপ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি শাব্দিক জ্ঞান অপেক্ষা অপরোক্ষ জ্ঞানেরই বেশী মহত্ত্ব প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন, "পুন্যশালী ব্যক্তি তিনিই যিনি কিছুই লেখাপড়া করেন নাই। আমি তো নিজেকে লেখাপড়া জানা একটি মহামূর্খ বলিয়া মনে করি। আমি কর্ম এবং জ্ঞানের কথা আর কি বলিব? যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন তখন আমি কর্মের মহত্ত্ব ও উৎকর্ষ প্রমাণ করি। যখন কেহ কর্মকে শ্রেষ্ঠ বলেন তখন আমি জ্ঞানের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কর্মকে হেয় সাবস্ত্য বা নির্ণীত করিয়া থাকি। যখন কেহ সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন আমি তামিল ভাষার পাণ্ডিত্য প্রকট করিয়া থাকি এবং তামিল ভাষার পণ্ডিতের নিকট আমি সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান প্রদর্শন করি। আমি এই ভাবে অপরকে ছোট প্রমাণ করিয়া নিজেকে বড় করিবার জন্য কতই না প্রয়াস করি। ইহা দ্বারা কি শিবকে প্রসন্ন করা যায়, না মুক্তি প্রাপ্তি হয়"? মহাত্মা তায়ুমানবরের শিষ্যদিগের মধ্যে অরুলয়্যরের এবং কোদিক্কারাইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা গুরুর সিদ্ধান্ত এবং অনুভবের কথা জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়াগিয়াছেন। এই কার্য তাঁহারা না করিলে আমরা এতবড় মহাপুরুষের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতাম না। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবর ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি সব সময়েই বাহ্য জ্ঞানশূন্য থাকিতেন এবং

সমাধিমগ্ন অবস্থায়ই তাঁহার শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে। সন্ত-সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে এবং শৈব সন্ন্যাসীদের পরম্পরায় মহাত্মা শ্রীতায়ুমানবরের পবিত্র চরিত্র যে চিরস্মরণীয় ও অমর হইয়া আছে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

———

অজ্ঞাত বনকুসুম

পঞ্চম কুসুম

ত্যাগী পণ্ডিত শ্রীবুনোরাম

(শ্রীরামনাথ শিরোমণি)

অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে যখন বঙ্গদেশ নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসনাধীনে ছিল সেই সময় নবদ্বীপে বাস করিতেন মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ছিলেন অতিশয় আস্তিক, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাবৎসল ভূস্বামী। ঈশ্বর, পরলোক এবং বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল হিমাচলের মতন অচল ও অটল। তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও পালন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বিদ্যানুরাগী প্রজা নবদ্বীপে বাস করিতেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অবাঙ্গালী বহু ছাত্র তথায় আসিতেন। উত্তর ভারতে কাশী যেমন বেদান্তশাস্ত্র পঠনপাঠনের জন্য প্রসিদ্ধ, তেমনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কেন্দ্রস্থান বলিয়া গণ্য হইত। মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন অতিশয় বিদ্যানুরাগী ও জনপ্রিয় বিখ্যাত নরপতি। যাহাতে তাঁহার রাজ্যে বিদ্যার অনুশীলন হয় সেইজন্য তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের বিদ্বান্ ত্যাগী পণ্ডিতদের ভরণপোষণের নিমিত্ত বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়া-

ছিলেন। উহার আয়েরদ্বারা অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ হইত এবং তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে সারা জীবন শাস্ত্রচর্চা ও ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেন।

মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির মধ্যে অরণ্যে একজন ন্যায়-শাস্ত্রের অগাধ বিদ্বান্ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীরামনাথ শিরোমণি। ঐ নামের অপর একজন পণ্ডিতও তথায় বাস করিতেন—তাঁহারও নাম ছিল শ্রীরামনাথ। দ্বিতীয় রামনাথ হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য প্রথম রামনাথের নাম রাখা হইয়াছিল "বুনো রামনাথ"। কারণ তিনি আপন পত্নীর সহিত শহরের বাহিরে বনের মধ্যে খড়ের ঘরে বাস করিতেন এবং ছাত্রগণও অধ্যাপকের সমীপে নির্জনে অবস্থানকরতঃ শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

একদিন বিশেষ কোন পর্বোলক্ষে পণ্ডিত শ্রীবুনোরামের সহধর্মিণী গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময় নবদ্বীপের মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী, মহারানীও গঙ্গাস্নানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহারানী যখন স্নান করিবার জন্য ঘাটে নামিতেছিলেন তখন পণ্ডিত বুনোরামের স্ত্রীর সহিত যে সব মহিলারা স্নান করিতে গমন করিয়া-ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মা ঠাকুরানী স্নান করিতেছেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে তবে আপনি ঘাটে নামিবেন।" মহিলাদের মুখে এই কথা শুনিয়া মহারানীর সাথের পরিচারিকাগণ বলিল, "আপনারা কাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন জানেন। ইনি নবদ্বীপের মহারানী—মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহধর্মিণী।"

মহারানী মনে ভাবিলেন, আমি এই দেশের মহারাজার স্ত্রী, মহারানী। আমাকে এই সকল মেয়েরা গঙ্গায় নামিতে নিষেধ করিতেছে, কারণ মা ঠাকুরানী স্নান করিতেছেন। কে এই মা ঠাকুরানী ? কিসের গরবে ইনি এত গরবিনী ? যাহার জন্য আমাকে তাঁহার সাথে স্নান করিতে বারণ করিতেছে। এই সব কথা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাকরতঃ মহারানী গঙ্গায় অবতরণ করিতে যাইয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলেন তখন মহারানী দেখিলেন ইনি একজন অতি সাধারণ দরিদ্র বৃদ্ধা সধবা স্ত্রী-লোক। তাঁহার পরিধানে একখানি মোটা মলিন লালপেড়ে শাড়ী এবং সধবার চিহ্নস্বরূপ হাতে দুইগাছা লাল-সূতা বাঁধা। হাতে দু'গাছা শাঁখা পর্যন্ত তাঁহার নাই। মা ঠাকুরানীকে দেখিয়া মহারানী মনে মনে একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ইনি এত গরীব যে হাতে দু'গাছা শাঁখা পর্য্যন্ত জোটে নাই। শাখার অভাবে সধবার চিহ্ন দুইগাছা লালসূতা হাতে বাঁধা। এই লালসূতা আর কয় দিন ? ইহা পচিয়া গেলেই ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়িবে।" মহারানীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীবুনোরামের স্ত্রী একটু হাসিতে হাসিতে গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া বলিলেন, "যেদিন আমার হাতের এই লালসূতা খসিবে সেদিন নবদ্বীপ অন্ধকার হইয়া যাইবে। এই লালসূতার প্রভাবেই আজ দেশ বিদেশ হইতে শত শত লোক ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে এই নবদ্বীপে আসে। যে দেশে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব সেই দেশ তো অন্ধকার। অরণ্যের তুল্য, মানুষের বস-বাসের অযোগ্য। রাজা আপন দেশেই পূজ্য কিন্তু বিদ্বান্ জগতের সর্বত্র পূজ্য হইয়া থাকেন।" গরবিনী মা ঠাকুরানীর মুখে শ্রীমতী

মহারানী এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে তাঁহার দীপ্তোজ্জ্বল মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে তিনি উপস্থিত মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ঐ বর্ষীয়সী মহিলা নবদ্বীপের ন্যায়-শাস্ত্রের বিখ্যাত প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবুনো রামনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া ডাকে "মা ঠাকুরানী"। বুনো রামনাথের সমকক্ষ ন্যায়শাস্ত্রের কোনও বিদ্বান্ পণ্ডিত সেই সময় বঙ্গদেশে; বঙ্গদেশে কেন সারা ভারত-বর্ষে ছিল না। সেইজন্য তাঁহার নিকট ন্যায়দর্শন পড়িবার জন্য ভারতের নানাস্থান হইতে পড়ুয়াগণ দলে দলে আসিতেন।

গঙ্গাস্নান হইতে মহারানী রাজভবনে ফিরিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজের নিকট বর্ণন করিলেন। মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৌতূহল পরবশ একদিন খোঁজ করিতে করিতে শহরের একপ্রান্তভাগে বনের মধ্যে অবস্থিত বুনো শ্রীরামনাথ শিরোমণি পণ্ডিতের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাথে কোনও রাজকর্মচারী বা সিপাহী, দ্বারবান্ পর্যন্ত লইয়া যান নাই। পাছে লোকজন, সিপাই, লস্কর দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিব্রত হইয়া পড়েন।

মহারাজা তথায় যাইয়া দেখিলেন একটি তেঁতুল গাছের তলায় বসিয়া একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত বহু ছাত্রকে তন্ময়তার সহিত মহর্ষি গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেছেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আগন্তুকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিই পড়িল না। যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া পণ্ডিত মহাশয় মাথা তুলিলেন তখন তিনি দেখিলেন একজন ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি অতিথিকে বসিতে নির্দেশ

করিলেন। পণ্ডিত শ্রীরামনাথ শিরোমণি মহাশয়কে প্রণামান্তে মহারাজা অতি সম্মানের সহিত কথায় কথায় প্রশ্ন করিলেন, তাঁহার কোনও অভাব আছে কিনা? ন্যায়শাস্ত্রে সাধারণতঃ "অভাব" বলিতে বুঝায় কোন সমস্যার অপূর্তি বা অমীমাংসিত বিষয়। তাই অধ্যাপক শ্রীবুনো রামনাথ শিরোমণি মহাশয় উত্তর দিলেন, "মহর্ষি শ্রীগৌতম বিরচিত ন্যায়দর্শনে এমন কোনও অভাব নাই যাহার উত্তর তিনি জ্ঞাত নহেন।" পণ্ডিতের মাথায় ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের স্থানই নাই। এতএব তাঁহার যে কোনও অভাবই নাই, ইহা তিনি সেই আগন্তুক ভদ্রলোককে জানাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জাগতিক কোন অভাব বা অনটনের ধারণাই নাই। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "আপনার এবং আপনার ছাত্রদের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছদনের কোনও অপ্রতুলতা আছে কিনা?" অতিথির মুখ হইতে এই প্রশ্ন শুনিয়া অধ্যাপক মহোদয় উত্তরে বলিলেন, "শিষ্যগণ গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল আনয়ন করে তাহদ্বারা অন্ন পাক হয়; আর এই তিন্তিড়ী-বৃক্ষের পত্রদ্বারা ব্রাহ্মণী সুস্বাদু অম্বল রন্ধন করেন। ছাত্রদের এবং আমাদের উভয়ের ইহাদ্বারাই পরিতোষ সহকারে আহার হইয়া থাকে। অতএব আমার ও ছাত্রদের আহারের জন্য কোনও অনটন বা অপ্রাচুর্য নাই।"

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার রাজত্বের মধ্যে এইরূপ একজন ত্যাগী, বিদ্বান্ মহাত্মা বাস করেন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বড়ই প্রসন্ন

হইলেন। তিনি পণ্ডিত শিরোমণি মহাশয়কে প্রভূত ভূসম্পত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোনও মতে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। মহারাজা বারংবার প্রার্থনা ও আগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি ভূমি গ্রহণে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "বিষয়-আশয় রক্ষা করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে, লোকের সঙ্গে মনোমালিন্যের আশঙ্কা আছে, উহাতে আসক্তি আসিবার সম্ভাবনা এবং মনে ভোগ-বাসনা প্রতিদিনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব শ্রেয়ঃ অভিলাষী ব্যক্তি উহা সর্বতোভাবে বিষবৎ ত্যাগ করিবেন। সাদাসিধে জীবন যাপন এবং অধ্যাত্মচিন্তাই মানবজীবনের পরম ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পক্ষে করণীয়। যাঁর যত অভাব কম, তিনি তত বেশী সময় ভগবৎচিন্তার জন্য পাইয়া থাকেন। অতএব আপনি আমাকে ধন সম্পত্তি দান করিয়া শ্রীভগবদ্বিমুখ করিবেন না। অকিঞ্চনের জীবনে ঈশ্বর-নির্ভরতা স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে, তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না।"

পূর্বে এই রকমই ছিল ব্রাহ্মণের স্বভাব। অল্পেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ত্যাগই ছিল তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। তাঁহারা শাস্ত্রচিন্তা ও ভগবৎচিন্তা লইয়াই সময় কাটাইতেন! খাওয়া, পরা, থাকা ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু সকল মানুষ আপন আপন প্রারব্ধ কর্মানুসারেই পাইয়া থাকে। এই সবের জন্য মানবের কোন বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। এই কথাই পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার বিবেকচূড়ামণি-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥

প্রারব্ধকর্মই শরীরকে পোষণ করে ; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চল-ভাবে ধৈর্য ধারণকরতঃ যত্নপূর্বক অধ্যাস (এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ) বা ভ্রম দূর কর। চেষ্টা করিতে হইবে জ্ঞানার্জনের জন্য এবং ভগবান্‌কে পাওয়ার জন্য। শ্রীভগবান্‌কে না পাওয়া পর্যন্ত বা নিজের স্বরূপকে না জানা পর্যন্ত মানুষের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিপূর্বক পরমশান্তি সুদূরপরাহত। তিনি সারাটি জীবন ছাত্র-দের অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাদান করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই, সাথে সাথে তাঁহার নিঃস্পৃহতা ও ত্যাগ ছিল অসাধারণ ও মনুষ্যের অনুকরণ ও অনুসরণের যোগ্য। এই গুণে ত্যাগী পণ্ডিত শ্রীবুনো রামনাথ শিরোমণি মহাশয় অদ্যাপি পণ্ডিত-সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন।

———

অজ্ঞাত বনকুসুম

ষষ্ঠ কুসুম

ভক্তপ্রবর শ্রীঅর্জুন মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ নদ অজয়। অজয়ের তীরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। তাহারই এক প্রান্তে বাস করেন ব্রাহ্মণ শ্রী অর্জুন মিশ্র। ইনি ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। কোন সময় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম ছিল কমলা। পতি-সেবাই ছিল সাধ্বী কমলার জীবনের একমাত্র কাম্য। সনাতন-ধর্মশাস্ত্র মতে নারীর পতিসেবা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই। নাম কমলা হইলে কি হইবে, মা কমলার শুভদৃষ্টি কখনও এই ব্রাহ্মণ দম্পতির উপর পতিত হয় নাই। সারাজীবন তাঁহাদের ভিক্ষান্নের উপরই নির্বাহ হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কখনও যে পেটভরা দুইবেলা ভোজন করিয়াছেন, ইহা বহু স্মরণ করিয়াও মনে পড়ে না।

বাড়ীতে ছোট ছোট চারিখানি খড়ের ঘর। পশ্চিমদিকের ঘরে বাস করেন সস্ত্রীক অর্জুন মিশ্র। উত্তর দিকের ঘরে আছেন শ্রীরাধামাধবের সুন্দর যুগল বিগ্রহ। পূর্বদিকের ঘরখানিতে করেন কমলা রন্ধন এবং দক্ষিণদিকের ঘরে থাকে একটি সবৎসা গাভী।

এই চারি ঘরের মাঝে ছোট্ট একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন উঠান। এই সকল ঘরের মাঝে কোণে কোণে কোথায়ও তুলসী মঞ্চ, কোথায়ও ডগডগে লাল জবাফুলের গাছ, কোথায়ও টগরফুলের গাছ, কোথায়ও বা বকুল, চাঁপা, বেলা, চামেলী ও যুঁই ফুলের বৃক্ষে শোভা বাড়াইয়াছে ছোট্ট বাড়ীখানির। কমলা প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে গোয়াল পরিষ্কার করেন এবং গোময় দ্বারা উঠানখানি লেপিয়া রাখেন। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেই মানুষের মনে সুন্দর একটি পবিত্র সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। এমনি ছিল সেই বাড়ীর বাতাবরণ। এই সকল নিত্য গৃহস্থের কার্য সমাপন করিয়া স্নানান্তে তিনি পতিদেবতার ইষ্টপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করেন, মালা গাঁথেন, চন্দন ঘষেন এবং পুষ্পপাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখেন যাহাতে স্বামীর পূজায় বসিতে বিলম্ব না হয়। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র অজয় নদে স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ সমাপনান্তে দেবপূজার জন্য এক ঘটি জল আনেন এবং বিধিপূর্বক তুলসীপত্র আহরণ করিয়া শ্রীরাধা মাধবের পূজায় মনোনিবেশ করেন। বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত অর্জুন মিশ্র শ্রীরাধামাধবের ভক্তিসহকারে পূজা করেন, মালা পরান এবং নিষ্ঠার সহিত সচন্দন তুলসীপত্র ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেন। কমলার দ্বারা নির্মিত ঘরের গরুর দুগ্ধের সামান্য একটু মাখন ও ক্ষীরের নাড়ু নিবেদন করিয়া পাড়ার সব ছোট ছোট বালক বালিকাদের আদরের সহিত বিতরণ করেন। ইহাই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন প্রাতঃকালের কার্যসূচী।

একটা প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে গৃহস্থের বাড়ীতে তুলসী বৃক্ষ, গাভী, দেববিগ্রহ এবং শিশু নাই সেই গৃহ শ্মশান তুল্য

কমলার ঘরে তুলসী, গাভী ও দেবতা আছেন কিন্তু শিশু না থাকায় তাঁহার মনের কোন এক নিভৃত স্থানে যেন ইহার অভাব মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিত। যদিও তাঁহারা উভয়েই শ্রীরাধামাধবের যুগলমূর্তির দ্বারাই তাঁহাদের পুত্রকন্যার সাধ মিটাইতেন। বাৎসল্য-ভাবেই তাঁহারা ঠাকুরের উপাসনা ও সেবা-যত্ন করিতেন। *

ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র প্রতিদিন পূজান্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া তবে জীবিকার্জনের নিমিত্ত ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন। আজও অন্যান্যদিনের ন্যায় গীতা পাঠ করিতে করিতে নবমোধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকে আসিয়া পাঠ তাঁহার বন্ধ হইল। পাঠ যেন তাঁহার কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার সখা ও ভক্ত পার্থকে বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যাহারা সকল কার্য হইতে বিরত ও অনবরত ধ্যানপরায়ণ হইয়া সর্বদা আমার উপসনা করিয়া থাকে, সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ এবং ক্ষেম আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি। অর্থাৎ তাহাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা আমিই করি। আমাকে ছাড়া যাহারা অন্য কাহারও নিকট কিছু আশা করে না বা যাচনা

* শাস্ত্রের নির্দেশ শ্রীভগবানের সহিত কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা বা উপাসনা করিতে হয়। পঞ্চভাবের মধ্যে যে কোন একটি ভাব গ্রহণকরতঃ উপাসনা করার বিধান যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণবধর্মে কান্তভাবে বা মধুরভাবে উপাসনাকেই উত্তম বলা হইয়াছে কারণ উহার মধ্যে অপর চারিটি ভাবই সন্নিবিষ্ট আছে।

করে না তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আমিই স্বয়ং তাহাদের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাই। এই কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীভগবানের অনন্য ভক্ত শ্রীঅর্জুন মিশ্রের মনে জাগিল ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তের বাড়ীতে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান ইহা কি কখন হইতে পারে ? অসম্ভব ! ইহা কখনও সম্ভব নহে। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের অভাব মোচন করেন বা তাহার আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ দান করেন, ইহা হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ং তিনি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া দিয়া আসেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। এই কথা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে আমার এত অভাব কেন ? আমি তো তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু আশা করি না। তবে আমার সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাও তিনি দিতেছেন কৈ ? বহন করিয়া আনা তো দূরের কথা। গ্রাসাচ্ছদনের জন্য যাহা অত্যাবশ্যক তাহা পর্যন্ত আমি পাইতেছি না। জীবনে কখনও স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অতএব শ্রীভগবান্ যে গীতায় বলিয়াছেন 'বহাম্যহম্' ইহা ঠিক নহে। খুব বেশী হইলে 'দদাম্যহম্' পর্যন্ত লেখা যাইতে পারে। 'বহাম্যহম্' শব্দ কোন প্রকারেই এখানে সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অর্জুন পণ্ডিত একটি কলম লইয়া 'বহাম্যহম্' শব্দটি দুইবার কাটিয়া সেই স্থানে 'দদাম্যহম্' শব্দটি লিখিয়া দিলেন। এই পরিবর্তন করিতে যাইয়া অর্জুনের হাত কাঁপিয়া উঠিল। 'বহাম্যহম্' শব্দ কাটিবার জন্য একবার তিনি কলম তোলেন আবার

রাখিয়া দেন। ভগবদ্বাক্যের উপর কলম চালান কম সাহসের কথা নয়! এইভাবে দুই তিনবারের চেষ্টায়, মনের দুঃখে, ক্ষোভে ও অভাবের তাড়ণায় অগত্যা তিনি কলমদ্বারা 'বহাম্যহম্' শব্দটি কাটিয়া দিলেন। আজ অর্জুন মিশ্রের গীতাপাঠ আর সমাপ্ত হইতেছে না। এদিকে কমলা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘরে একটি তণ্ডুলকণাও নাই। যাহাদের নিত্য ভিক্ষাই উপজীবিকা তাহাদের ঘরে চাউল থাকিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। কি দিয়া আজ শ্রীরাধামাধবের ভোগ হইবে, এই ভাবনায় কমলা ব্যাকুল। আকাশে সূর্যদেব মাথার উপর, আর দেরী করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার ভাববিভোর পতিদেবতাকে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন—"কি গো, কখন ভিক্ষায় বাহির হইবে? বেলা যে দুপুর হয়ে গেল। ঘরে যে একটিও চাউল নাই। ঠাকুরের ভোগ কখন হইবে? আজ কি রাধামাধব উপবাসী থাকিবেন? ওঠো, ভিক্ষায় বাহির হও।"

পত্নীর কথায় ব্রাহ্মণের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি পাঠ শেষ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র ভিক্ষায় ক্ষিপ্রগতিতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। কয়েক-দিন যাবৎই দেখা যাইতেছে গ্রামে ভিক্ষায় যাহা প্রাপ্ত হন তাহাদ্বারা দুইজনের এক বেলাও পেট ভরে না। কদিন আর এইভাবে আধপেটা খাইয়া থাকা যায়। পতিকে পেটভরা অন্ন দিয়া কমলা প্রায়ই অর্ধাশনে কখনও বা অনশনে কাটাইয়া দিতেছেন। এই কারণে তিনি দিন দিনই কৃশ হইয়া পড়িতেছেন। তথাপি তিনি একদিনের

জন্যও পতিদেবতাকে ঘুণাক্ষরেও মুখ ফুটিয়া এই অবস্থার কথা বলেন নাই বা তাঁহাকে ইহা জানিতে দেন নাই। কিন্তু অর্জুন মিশ্রের ইহা না জানিতে পারার কোন কারণ নাই। কারণ তিনিই তো প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া আনেন—যাহা অন্ন তিনি পান তাহা দ্বারা যে দুজনের পেট ভরিতে পারে না তাহা তিনি বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারেন। তাই আজ অধিক ভিক্ষার আশায় তিনি একটু দূরে অন্য গ্রামে গমন করিলেন। গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রের তাপে শ্রীঅর্জুন মিশ্র ঘর্মাক্ত কলেবর। পথে মাঠের ধারে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যেই একটু গড়াইয়াছেন, অমনি নিদ্রাদেবী তাঁহাকে স্বীয় স্নিগ্ধ ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। শ্রান্ত দেহ, উদরে ক্ষুধা, পিপাসায় শুষ্ক তালু—অশ্বত্থবৃক্ষের ঝিরঝিরে বাতাসে কতক্ষণ যে তিনি নিদ্রাদেবীর কোলে সংসারের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সুখে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মণ অর্জুনের জ্ঞান ছিল না। যখন তিনি জাগ্রৎ হইলেন তখন দেখিলেন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি তিনি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে ভাবিতেছেন না জানি কমলা তাহার জন্য কতই চিন্তা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ শ্রীঅর্জুন মিশ্র গীতাপাঠ সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবার কিছু পরেই কমলা দেখিলেন একটি শ্যামবর্ণের কিশোর বার-চৌদ্দ বৎসরের বালক মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর

ডাগর চোখ, মুখখানি সদ্য প্রস্ফুটিত নীলকমলের ন্যায় অত্যন্ত লাবণ্যযুক্ত, কাঁধে বাঁক লইয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্রের বাড়ী ?"

কমলা—"কেন বাবা, তাঁহার বাড়ী খুজিতেছ কেন ?"

বালক—"ব্রাহ্মণ শ্রীঅর্জুন মিশ্র এই সব সামগ্রী তাঁহার স্ত্রীকে দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি আসিতেছেন। এই সব রাধিয়া ভোগ প্রস্তুত করিতে করিতে তিনি আসিয়া পড়িবেন। তিনি আসিয়া শ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন করিবেন।"

এই কয়েকটি কথা বলিয়াই বালক তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য উদ্যত হইলে কমলা বলিলেন—"বাবা তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তোমার শরীর দিয়া ঘাম পড়িতেছে। একটু বসো, বিশ্রাম কর। ভোগ নিবেদন হইলে ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া যাইও।"

বালক—"আমার কি বিশ্রাম করিবার সময় আছে ? আমাকে এই ভাবে বাড়ী বাড়ী সব জিনিস বহন করিয়া পৌঁছাইতে হয়। একটু দেরী করিলে কি আর রক্ষা আছে! তোমাদের বাড়ী এই সব খাদ্য দ্রব্য আনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, এই দেখ! তোমার স্বামী আমাকে কেমন মারিয়াছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে বালক তাহার পিঠ কমলাকে দেখাইল। কমলা দেখিলেন বালকের পৃষ্ঠে সত্যই দুইটি প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। আঘাতের স্থান দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। ক্ষতস্থান দেখিয়া কমলা কাঁদ কাঁদ স্বরে বালককে বলিলেন—"বাবা, আমার

স্বামী তো এমন নির্দয় ও পাষাণ নহেন যে বালকের পৃষ্ঠে এমন প্রহার করিবেন ?”

বালক—“তবে কি আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি ? দেখ না, কেমন মেরেছেন, রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে।”

কমলা—“না বাবা, তুমি মিথ্যে কথা বলিবে কেন ? তাঁহার কেন আজ এমন দুর্বুদ্ধি হইল ? কেন তিনি এত নিষ্ঠুর হইলেন ! এমন সুন্দর ছেলের গায়ে কেন তিনি আজ এইভাবে প্রহার করিলেন ? যাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়, আদর করতে মন চায়, তাকে ব্রাহ্মণ কেন আজ এমন ক'রে মারলেন ?”

এই কথা কমলা শেষ না করিতেই দেখেন বালক অতিশয় দ্রুত গতিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াগেল। এক মুহূর্তও আর সেথায় অবস্থান করিল না। কমলার চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ইহার মর্ম তিনি কিছুই বুঝিলেন না। এই সুন্দর বালক কে ? কোথা হইতে এত জিনিস পত্র আনিল ? কেনই বা তাহার স্বামী এমন সুন্দর বালককে প্রহার করিলেন ? এই সবই যেন কমলার নিকট আজ প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

কমলা রন্ধন করিয়া শ্রীরাধামাধবের সম্মুখে ভোগ থরেবিথরে সাজাইয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিবেন। অনেক দেরী হইতেছে দেখিয়া কমলা পতির জন্য অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ভিক্ষা করিতে যাইয়া কেন তিনি একখনও ফিরিতেছেন না ? তবে কি পথে

কোন বিপদ ঘটিয়াছে ? এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া কমলা একবার বাড়ীর বাহির যাইতেছেন আবার বাড়ীর ভিতরে আসিতে-ছেন। এইভাবে অস্থিরতার মধ্যে তিনি সময় ক্ষেপ করিতেছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিতেই দেখিলেন স্ত্রী কমলা বাড়ীর বাহিরে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে এই রকম উদ্বিগ্ন দেখিয়া কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মতন হইয়া পড়িলেন। তাহারই তো অপরাধ হইয়াছে, কারণ তিনি পথে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন লইয়া ফিরিতে অতিশয় বিলম্ব হইয়াছে। কখন রন্ধন হইবে ? কখন শ্রীরাধামাধবের ভোগ হইবে ? এই সব কিন্তা করিয়াই বোধ হয় কমলা চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি কমলার হস্তে ভিক্ষার ঝুলিটি প্রদান করিয়া অপরাধীর ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কি যে করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া কমলা অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি কখন সব রান্নাবাড়া করিয়া শ্রীরাধামাধবের সম্মুখে ভোগ সাজাইয়া তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি আসিয়া ঠাকু-রকে ভোগ নিবেদন করিবে। তোমার এত দেরী হইল কেন ? চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, ময়দা, চিনি, তরিতরকারী, দৈ, মিষ্টি ইত্যাদি তো তুমি কখন পাঠাইয়াদিয়াছ। এত বিলম্ব হইবার কারণ কি ? আচ্ছা বল তো, এত সব সামগ্রী আজ তুমি কোথায় পাইলে। ঠাকুরের এক মাসের ভোগ ইহাদ্বারা চলিবে। আমাদের জীবনে

এত জিনিস একসঙ্গে কখনও দেখি নাই। কে এমন দয়ালু যে এই সব দিল। কমলা এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া পতির মুখের দিকে ইহার উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া অর্জুন মিশ্র একেবারে আকাশ থেকে পড়িলেন। তিনি কমলার এই প্রলাপ বাক্যের মর্ম কিছুই অনুধাবন করিতে পারিতে ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন—"কমলা, তুমি এই সব কি বলিতেছ? কোন কল্পনার রাজ্যে তুমি বিচরণ করিতেছ? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতেছি না। অধিক ভিক্ষার আশায় আজ আমি বহু দূরে এক গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। ভিক্ষা করিয়া ফিরিবার পথে পরিশ্রান্ত হইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় একটু বিশ্রাম করিতেই জানিনা কেন যেন ঘুমাইয়া পড়ি। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখি বেলা প্রায় যায় যায়। তাই তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিতেছি আর মনে মনে চিন্তা করিতেছি কখন তুমি রাঁধিবে, কখন শ্রীরাধা মাধবের ভোগ হইবে। এক কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি দিশে হারা হইয়া পড়িতেছি। তুমি যাহা সব বলিলে আমি তার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো কাহাকেও দিয়া কোন কিছুই পাঠাই নাই। ভিক্ষায় যাহা পাইয়াছি তাহা আমি নিজেই নিয়া আসিয়াছি। তা ছাড়া এত জিনিস আমি পাইবই বা কোথায়? কে আমাকে এত সব দিবে?"

কমলার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হাত পা ধুইয়া ঠাকুরঘরে যাইয়া তিনি দেখেন শ্রীরাধামাধবের সম্মুখে কমলা অন্ন ও নানাপ্রকার

ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া থরেবিথরে ভোগ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ভোগ নিবেদন করিতে করিতে অর্জুন মিশ্রের দুই চক্ষু বাহিয়া অঝরে অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। তাঁহার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না যে ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বক্তা শ্রীভগবানেরই অহৈতুকী কৃপা। ভোগ নিবেদন শেষ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতেই দেখাগেল পাড়ার সব ছোট ছোট বালক বালিকারা প্রসাদ পাইবার জন্য কলাপাতা হাতে লইয়া উপস্থিত। তাহারা একবাক্যে সকলে বলিল একটি বার কি চৌদ্দ বৎসরের কাল রংগের ছেলে তাহাদের সকলকে এই বাড়ী ঠাকুরের প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে। সাথে সাথে তাহাদর সকলকে কলাপাতা নিয়া আসিতেও বলিয়াছে। পাড়ার ছেলে মেয়েরা সকলে পরিতোষের সহিত প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলে, কমলা তাহার স্বামী অর্জুন মিশ্রকে বলিলেন— "তুমি এত নিষ্ঠুর হইলে কি করিয়া? ঐ বালকটি জিনিসপত্র আনিতে একটু দেরী করিয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে এমন প্রহার করিয়াছ যে তাহার পিঠ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। তুমি তো কখনও এইরূপ নির্দয় পাষাণ ছিলে না। ছেলেটিকে মারিবার সময় তোমার হৃদয়ে কি একটু দয়া হইল না। আজ তোমার এমন দুর্বুদ্ধি হইল কেন? এমন সুন্দর বালকটিকে এইভাবে মারিয়া তাহার পিঠ ফাটাইয়া দিয়াছ যে ক্ষতস্থানে রক্ত জমিয়া আছে।"

পত্নীর মুখে এইরূপ ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া নিরীহ ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র ইহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সজল নয়নে বলিলেন—

"কমলা, তুমি ঐ সুন্দর কিশোর বালকটিকে চিনতে পার নাই
সত্যই আমি বড় অপরাধী! শ্রীভগবানের বাক্যে আমার বিশ্বা
নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বাঙ্ময়ী
মূর্তি। আমি আজ সকালে পূজার পর গীতা পাঠ করিতে করিতে
ভগবানের বাক্য অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত একটি শ
'বহাম্যহম্' কলমদ্বারা দুইবার কাটিয়া 'দদাম্যহম্' লিখিয়া দিয়াছি
সেই দুইবার কর্তনের দাগ যাইয়া শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশে আঘা
করিয়াছে। আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি। আমার এই অপরা
অমার্জনীয়। শ্রীভগবান্ যে তাঁহার অনন্য ভক্তের যাবতীয় আব
কীয় বস্তুসম্ভার স্বয়ং বহন করিয়া পৌঁছাইয়া থাকেন তাহাই আ
এই বালকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার এই অবোধ অপরাধী পাষ
টাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গেলেন যে গীতাবাক্যে বিশ্বা
না করিয়া আমি বড়ই পাপ করিয়াছি। ঐ বালক সাধারণ বাল
নহে। কমলা! উনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা পার্থসারথি
ভগবান্ শ্রীবাসুদেব। তুমি ধন্য, কমলা! তুমি ভগবান্কে দর্শ
করিয়াছ, তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছ, তাঁহাকে আদর করিয়াছ
তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। আমি নিতান্ত অধম, তাঁহার শ্রীদেহে আঘা
করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার এই ঘোর মহাপাতকে
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই অপরাধের জন্য অনন্তকাল পর্য
নরকভোগ করিয়াও আমার নিস্কৃতির কোন আশা নাই। অর্জু
মিশ্র এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে মনের দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে
না পারিয়া ভূমিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যখন তাহা

বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তিনি দেখিলেন তিনি শ্রীরাধা-মাধবের চরণপ্রান্তে শায়িত এবং মাথার কাছে বসিয়া কমলা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন।

পরের দিন পূজা, পাঠ সমাপন করিয়া বাহিরে আসিতেই অর্জুন মিশ্র দেখিতে পাইলেন যাঁহার জমিদারীর এলাকার মধ্যে তিনি বাস করেন সেই জমিদার স্বয়ং দুইজন লোকের মাথায় প্রচুর খাদ্যসামগ্রী লইয়া বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন গত রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী স্বয়ং শ্রীভগবান্ একখানা গীতা হস্তে করিয়া তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার পরমভক্ত বৈষ্ণব সাধু শ্রীঅর্জুন মিশ্র তোমার প্রজা। তিনি অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নিত্য তাঁহার শ্রীরাধামাধব বিগ্রহে আমার পূজা এবং আমাদ্বারা কথিত শ্রীগীতা পাঠ করিয়া থাকেন। যিনি নিত্য আমার পূজা ও মদোক্ত গীতা পাঠ করেন তাহার উপর আমি সদা প্রসন্ন থাকি। এত দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ অর্জুন মিশ্র ভিক্ষা করিয়া আমার সেবা-পূজা করিতেন। এখন বয়সের দরুন শরীর অপটু হইয়াছে, সেই জন্য ভিক্ষা করিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি আগামীকাল হইতে যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী জীবিত থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত তুমি তাঁহাদের ভরণপোষণের সব ব্যবস্থা করিও। তাঁহাদের সেবা আমারই সেবা বলিয়া জানিবে। আমার ভক্ত, আমার প্রাণের সমান প্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমার অনন্য ভক্তের যাবতীয় যোগ এবং ক্ষেম আমি এই

ভাবে স্বয়ং বহন করিয়া থাকি। আমার এই আদেশ তুমি প্রতিপালন করিলে সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ হইবে এবং আমি তোমার উপর প্রসন্ন থাকিব।" এই কথা বলিয়াই শ্রীভগবান্ অদৃশ্য হইলেন এবং সাথে সাথে আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার পরম ভক্ত হনুমান্‌কে অদ্ভুতরামায়ণের উত্তর কাণ্ডে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

যো বা নিন্দতি তং মূঢ়ো দেবদেবং স নিন্দতি।
যো হি তং পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা স পূজয়তি মাং সদা॥

যে মূঢ় আমার ভক্তের নিন্দা করে, সে দেবদেব ভগাবান্ আমারই নিন্দা করে। যিনি ভক্তিভাবে আমার ভক্তের পূজা করেন, তিনি সদা আমারই পূজা করিয়া থাকেন। ভক্ত এবং ভগবান্ যে অভিন্ন তাহারই ইঙ্গিত এখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরাঘবেন্দ্র এইভাবে করিয়াছেন।

"তাঁহার নির্দেশানুসারে আমি যৎসামান্য কিছু আপনাদের সেবার জন্য আনিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন আমার কোন কর্মচারী আপনার নিকট আসিবে। আপনাদের যাহা প্রয়োজন তাহাকে বলিলে সে যথাসময়ে সেই সব দ্রব্য আপনাদের সেবার জন্য এখানে পৌঁছাইয়াদিবে। এই সেবাটুকু আমি করিতে পারিলে আমার জীবনধারণ সার্থক বলিয়া জানিব। পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া আমার উপর এইরূপ আদেশ করাতে তাঁহার অহৈতুকী কৃপারই পরিচয় পাইলাম। আমার জীবনে এমন কোন

শুভকর্ম আমি করি নাই যাহার ফলে ভগবানের আদেশ পাইতে পারি।" এইভাবে বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীরাধামাধবকে দর্শন-করতঃ জমিদার চলিয়া যান।

ভক্তপ্রবর শ্রীঅর্জুন মিশ্র অবশিষ্ট জীবন শ্রীভগবানের করুণায় নিশ্চিন্তমনে শ্রীরাধামাধবের সেবা-পূজা ও সাধন-ভজন করিয়া পরিণত বয়সে ভগবদ্ধামে গমন করেন

———

অজ্ঞাত বনকুসুম

সপ্তম কুসুম

গৃহস্থযোগী শ্রীতারিণীচরণ

অধিকাংশ লোকের ধারণা যোগী হইতে হইলে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা অকৃতদার ব্রহ্মচারী হওয়া প্রয়োজন। গিরি গুহায় কিংবা গহন অরণ্যে বাস না করিলে যোগাভ্যাস করা যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বর্তমান যুগে প্রকৃত যোগী হওয়া এক

প্রকার অসম্ভব। আজকালকার দিনেও যে গৃহস্থদের মধ্যে ত্যাগী ও যোগশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নাই, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করা যাইতেছে। উচ্চ-কোটির যোগী ছাড়া কেহ নিজের বা অপরের মৃত্যুর স্থান ও সময় নির্ধারণ করিতে পারে না। ইহার পশ্চাতে কর্মসূত্র বা নিয়তি এমন ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে যে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা কেবল শক্তিশালী যোগীর পক্ষেই সম্ভব।

পূর্ববঙ্গের বর্তমান বাঙ্গলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি অতি ছোট গ্রাম নলহাতা বা নলতা। বর্ষার কয় মাস গ্রামের চতুর্দিক জলে ভরিয়া যায়। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে নৌকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। যত দূর দৃষ্টি যায় বর্ষার সময় চারিদিকে কেবল ধানের ক্ষেতই দেখা যায়। মাঝে মাঝে এক একখানি বাড়ী দ্বীপের মত দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরগুলিই ছনের (খড়ের) নির্মিত। কোন কোন বাড়ীতে দুই একখানা টিনের ঘর—ভিত (ভিটা) সব ঘরেরই মাটির। গ্রামটি কোন সময় ব্রাহ্মণ প্রধানই ছিল তবে দুই চারি ঘর অন্য বর্ণের লোক যে তথায় বাস করিত না এমন নহে। কিছু দূরে কয়েকঘর মুসলমানেরও বাস ছিল সেই গ্রামে। সবার মধ্যে ছিল বেশ একটা প্রীতির বন্ধন।

এই গ্রামে বাস করিতেন শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ শ্রীতারিণী চরণ চক্রবর্তী। বাল্যাবস্থায় তারিণী চরণ গ্রামেই পাঠশালায় পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সাধারণ বাংলা পড়া শোনা করিয়া পরে

মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই পূর্বসংস্কার অনুসারে তাহার মধ্যে দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া বাড়ীর সকলে মনে করিত হয় তো কোন মহাপুরুষ সাপভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল প্রভৃতি সকল পূজা পার্বনই হইত এবং বালক তারিণীচরণ উৎসবের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান অতিশয় নিষ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিত। পূর্বজন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপ ধার্মিক পিতা-মাতার ঘরে এইরূপ সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৬।৪১-৪২

যোগভ্রষ্ট বক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া সেইস্থানে বহু বৎসর বাসকরতঃ পবিত্র অথচ সম্পত্তিশালী মনুষ্যগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৪১॥ অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন; মনুষ্যলোকে এই প্রকার যোগিগণের কুলে জন্ম যোগ-ভ্রষ্টগণের পক্ষে অতি দুর্লভ॥ ৪২॥

তারিণীচরণের পিতা পুত্রকে গর্ভাষ্টমে উপনয়ন দিয়া স্বয়ং প্রতিদিন প্রাতেঃ ও সায়াহ্নে সন্ধ্যা করাইতেন এবং নৈতিক শিক্ষা দিতেন। সেই সময়কার বাংলাদেশের প্রথানুসারে পিতা

শ্রীতারিণীচরণকে অল্প বয়সেই একটি সৎব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পূর্ব দিন শ্রীশ্রীকালীপূজার নিয়ম সেই সময় অনেক বাড়ীতেই প্রচলন ছিল। আজও, এই জড়বাদের যুগেও কোন কোন বনিয়াদী ভদ্রবংশে এই প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়। তারিণীচরণের বিবাহের আগের দিনও শ্রীশ্রীকালীপূজা হইয়াছিল। উঁহাদের নিয়ম শ্রীশ্রীকালীপূজা গুরুদেব করিতেন এবং শ্রীশ্রীতুর্গা-পূজা করিতেন পুরোহিত। কালীপূজায় তন্ত্রধারক হইতেন পুরো-হিত এবং তুর্গাপূজায় তন্ত্রধারকের কার্য করিতেন গুরুদেব। গুরু খুব বড় পণ্ডিত না হইলেও তিনি একজন উচ্চকোটির শক্তিসম্পন্ন যোগী ও মাতৃ-সাধক ছিলেন।

একবার শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় গুরুদেব শিষ্য বাড়ী আসিয়া-ছেন। চণ্ডীমণ্ডপে পূজা করিতে বসিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন বাড়ীর যুবকেরা পূজার সময় কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। তুই চারিজন বৃদ্ধ পুরুষ ও মেয়েরা পূজার মণ্ডপে বসিয়া মায়ের পূজা দর্শন করিতেছেন। গুরু লেখাপড়া বেশী জানেন না বলিয়া বাড়ীর কাহারও কাহারও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি তেমন ছিল না। গুরুদেব ইহা জানিতেন। দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর গুরুদেব বলিলেন, "বাড়ীতে মা আসিয়াছেন আর বাড়ীর লোকেরা সব যে যার ঘরে নিদ্রা যাইতেছে কিংবা বৈঠকখানায় বসিয়া তাস-পাশা খেলিতেছে ও গল্পগুজব করিতেছে। ইহাদ্বারা কি মায়ের অপমান করা হইতেছে না? উঁহারা মনে করিতেছে গুরু মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, সে আবার কি কালীপূজা করিবে? মা যে এই পূজায় আসিয়াছেন তাহার প্রমাণ আজ তোমাদের আমি

চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া পূজার কোষা হইতে কোষীখানা লইয়া শ্রীশ্রীমা কালীর দক্ষিণ চরণে আঘাত করিলেন। দেখা গেল শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ক্ষত হইয়া সেই স্থান হইতে ফিনকিদিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে এবং সাথে সাথে যে ঘরে বসিয়া ছেলের দল তাস, পাশা খেলিতেছিল এবং গল্পগুজব করিতেছিল সেই ঘরের চালায় আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ ও মহিলারা ইহা দেখিয়া গুরুদেবের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং "ঠাকুর! রক্ষা করুন; রক্ষা করুন", বলিয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব দয়া করিয়া মায়ের পায়ের ক্ষতস্থানটি টিপিয়া ধরিতেই রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হইল। এমনি ছিল তাঁহার অসাধারণ যোগজশক্তি ও মাতৃভক্তি।

তিনি যে খড়-কুটা ও মাটির নির্মিত কালীর পূজা করেন না, তাহা তিনি এইভাবে সেইদিন সকলকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন। সাথে সাথে ইহাও প্রমাণ হইল যে স্বয়ং দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন" শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাতা নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর স্থান তাই এত উর্ধ্বে রাখা হইয়াছে।

তারিণীচরণের বিবাহের সময় শ্রীশ্রীকালীপূজা করিতে আসিয়া শিষ্যদের বিশেষ অনুরোধে শ্রীগুরুদেব কিছুদিন শিষ্যবাড়ী থাকিয়া যান। সেই সময় যুবক শ্রীমান্ তারিণীচরণের শ্রদ্ধা-ভক্তি, আচার-নিষ্ঠা ও দেবদেবীর উপর বিশ্বাস অবলোকন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব নব বিবাহিত তারিণীচরণ ও তাহার স্ত্রীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

গুরুদেব উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া তাহাকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ করেন। তারিণীচরণও গুরুর নির্দেশমত অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নিয়মিতভাবে সাধনে তৎপর থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্বপুরুষের বহু ধানের ক্ষেত ছিল। ক্ষেতে ধান, ডাল ও পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত তাহাদ্বারাই তাহাদের সংসার-যাত্রা ভালভাবেই নির্বাহ হইত। গ্রাসাচ্ছাদনের কোন প্রকার অভাব বড় ছিল না। সাংসারিক অনটন না থাকিবার দরুন তারিণীচরণ নিশ্চিন্ত মনে গুরুর নির্দিষ্ট উপদেশ মত সাধন, ভজন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখনও কেহ তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বড় দেখে নাই। তিনি ঘরে বসিয়াই একাগ্র মনে ও গুরুর প্রদর্শিত পথে সাধন করিতেন।

তাঁহার তিনটি পুত্র সন্তান ছিল। বড় ছেলে ব্রজেশ ঢাকা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করিয়া বিহার প্রদেশে চাকুরী লইয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র সুরেশ ও রমেশ দুই ভাই আসামে ব্যবসা করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছেন। গ্রামের বাড়ীতে বারমাসের তের পার্বণ লাগিয়াই আছে। দোল, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা সবই বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামের ছোট বড় সকলকেই এই উৎসবাদিতে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তারিণীচরণ সকলের আনন্দবর্ধন করেন। বিরাট বাড়ী—তাহাতে পাঁচ ছয় শরিক। বাড়ীর অংশিদারগণ সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কাহারও বড় অভাব নাই। সকলেরই অল্প বিস্তর খেতখামার আছে

এবং কেহ কেহ পৌরহিত্য করিয়াও সংসারের ব্যয় বহন করিতেন। ইহার পূর্বে কেহ বাড়ী ছাড়িয়া অর্থোপার্জনের জন্য অন্য কোথায়ও যায় নাই। তারিণীচরণের সময় হইতেই বাড়ীর ছেলেরা কেহ কেহ ইংরাজী পড়িয়া চাকুরী কিংবা ব্যবসা করিতে বাঙ্গলার বাহিরে যাইতে আরম্ভ করে।

পাঁচ বৎসর পর পর এক এক শরিকের ভাগে দুর্গাপূজা, কালী-পূজা এবং দোলের পালা পড়ে। লক্ষ্মীপূজা এবং সরস্বতীপূজা প্রত্যে-কেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপন আপন ঘরে করিয়া থাকেন। এবার দুর্গাপূজার পালা তারিণীচরণের ঘরে। মহালয়ার পরেই সব ছেলেরা আপন আপন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের লইয়া পূজায় বাড়ী আসিয়াছেন। মঙ্গলমত অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও মহামায়ার পূজাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীপূজার পরই ছেলেরা সকলে সপরিবারে যার যার কর্মস্থলে চলিয়া যাইবেন। পূজার পরই যে কোন কারণেই হউক তারিণীচরণের জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। সেই সময় তাঁহার বয়স অনুমান ৬৫ কি ৭০ হইবে। তাঁহার বহু দিনের বাসনা শেষ জীবন যেন হিন্দুর সর্ব প্রধান তীর্থ কাশীধামে শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের চরণে অতিবাহিত হয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মা গঙ্গার পাড়ে বারাণসী পুণ্যক্ষেত্রে দেহত্যাগ হইলে পুনরায় আর মাতৃগর্ভে আসিতে হয় না। শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

মুমূর্বোর্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ন্।
উপদেক্ষ্যসি মন্মন্ত্রং স মুক্তো ভবিতা শিবেতি॥

মরণোন্মুখ ব্যক্তির কর্ণে যদি কেহ কাশীক্ষেত্রে রাম নাম উপদেশ করেন অথবা স্বয়ং উচ্চারণ করে তাহা হইলে আমার মন্ত্রের প্রভাবে

সে মুক্ত হইয়া যায়। ইহা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত শ্রীরামগীতাতেও কথিত আছে—

প্রাণাংস্ত্যজন্তো মণিকর্ণিকায়াং যদ্বাচকং তারকমুচ্চরন্তঃ।

শ্রুত্বা চ বেদান্তমুপাস্যবাচং পশ্যন্তি মামেব হি বিশ্বনাথম্॥

যাঁহারা মণিকর্ণিকাতীর্থে শ্রীরামবাচক মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহারা সেই বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং উহার উপাসনার দ্বারা বিশ্বনাথরূপী আমাকেই দর্শন করেন।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডেও ভগবান্ শ্রীবিশ্বনাথ বলিতেছেন-

কাশ্যাং মরণাং মুক্তিঃ। কাশীতে মরিলে মুক্তি হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীপূজার পর তিনি একদিন তিন ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার শরীর ভাল না। বয়সও হইয়াছে। আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছেন, তোর শেষদিন অতি নিকট। যদি কোন বাসনা থাকে তাহা পূর্ণ করিয়া ফেল। আমার বড় ইচ্ছা আমার এই দেহ যেন কাশীতে ত্যাগ হয়। তোরা আমার সুযোগ্য তিনটি পুত্র। সকলেই দু'টো পয়সা রোজগার করিতেছিস। আমাকে তোরা কাশী নিয়া চল। আমি দেখিতেছি আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন কাশীতে আমার প্রাণবায়ু বাবা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণে মিলাইয়া যাইবে। তোরা তো তিন ভাইই যে যার কর্মস্থলে চলিয়া যাইবি, তখন আমাকে কে কাশী লইয়া যাইবে? তোদের মাকে জিজ্ঞাসা কর করে তিনি কাশী যাইতে পারিবেন? তোদের তিন জনের মধ্যে কেহ একজন আমার সঙ্গে চলিলেই হইবে। তোরা তো কেহই বেশী দেরী করিতে পারিবি না। শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেল।"

ছেলেরা তিন জনে পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, পিতার আদেশ কিছু অন্যায় আদেশ নহে। ইহা তাহাদের পালন করাই উচিত। তাহারা তিন জনে মাতাকে তাহাদের পিতার কাশীবাসের প্রবল ইচ্ছা জানাইলেন এবং পিতার সঙ্গে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রার্থনা করিলেন। তারিণীচরণের পত্নী এই প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ওনার সামান্য একটু জ্বর ও পেট খারাপ হইয়াছে। কয়েক দিন একটু চিকিৎসা করিলেই উনি ভাল হইয়া যাইবেন। আমি তো এখন কাশী যাইবার কোন প্রয়োজন মনে করিনা। মরার মতন তো এমন কোন অসুখ ওনার নয় যে এখনই কাশী নিয়া যাইতে হইবে। বুড়োর ভীমরতি হইয়াছে।" তিনি কোন মতেই কাশী যাইতে রাজী নহেন এবং পতিকে কাশী পাঠাইতেও ইচ্ছুক নহেন। তারিণীচরণ যখন দেখিলেন পত্নী কোন প্রকারেই কাশী যাইতে সম্মত নন তখন তিনি ছেলেদের বলিলেন, "দুর্গামোহনদাদা সপরিবারে কাশীবাস করিতেছেন। তাঁহাদের কাছে আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়ে আয়। তাঁহারাই সকলে আমার দেখা শোনা করিবেন। তোদের মাকে কাশী যাইতে হইবে না। তিনি বাড়ীতেই আরামে থাকুন।"

তিন ছেলে মিলিয়া এই স্থির করিলেন, যে মাতা যখন কোন প্রকারেই কাশী যাইতে স্বীকার হইতেছেন না, তখন বড় ভাই ব্রজেশ সস্ত্রীক পিতাকে নিয়া কাশী যাইবেন এবং স্ত্রীকে পিতার সেবার জন্য তথায় রাখিয়া তিনি তাহার কর্মস্থল বিহারে একাই ফিরিয়া আসিবেন।

তারিণীচরণের কাশী যাইবার দিন স্থির হইলে পত্নী বিচার

করিয়া দেখিলেন পতির সহিত কাশী না যাওয়াটা তাহার পক্ষে কোন প্রকারেই শোভা পায় না এবং লোকেও নিন্দা করিবে যে পতির সহিত পত্নী সেবার জন্য গেল না। লক্ষ্মীপূজার পর বড় ছেলে ব্রজেশ সস্ত্রীক পিতামাতাকে লইয়া কাশী রওয়ানা হইলেন। কাশী পৌঁছিয়া প্রথম শ্রীদুর্গামোহনদাদার বাসায়ই উঠিলেন। সেথায় স্থানের অভাব হওয়ায় অতিশয় নিকটেই থালিসপুরায় ৺লাল মোহন সেনের বাড়ীর নীচের তলায় দুইখানি বড় বড় শয়ন কক্ষ ও একখানি রান্নার ঘর ভাড়া করিয়া তারিণীচরণ তাঁহার পত্নী ও পুত্র-বধূকে নিয়া পরমানন্দে কাশীবাস করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তাঁহার এতদিনের অভিলাষ এইভাবে পূর্ণ হইল। কাশী আগমনের পর হইতেই তাঁহার মনের আনন্দ চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিল। সর্বদা তিনি এক দিব্য আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কাহারও সহিত বড় কথাবার্তা বলেন না— সদাই একটা অন্তর্মুখী ভাব। পত্নীর অমতে কাশী আসা হইয়াছে সেই-জন্য তিনি পতির কাছে বেশী আসেন না, পুত্রবধূই শ্বশুরের যাবতীয় সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় শরীর ও খুব বেশী খারাপ নহে। কাশীবাসের আনন্দে তারিণীচরণের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ভালভাবেই কাটিল। শুইয়া বসিয়া প্রায় সর্বক্ষণই তারিণীচরণ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে শ্রীগুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। তিনি পুত্রবধূকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন পৌষ বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির আর কয় দিন বাকী? পুত্রবধূ শ্বশুরকে জিজ্ঞসা করিতেন, "আপনি পৌষ সংক্রান্তির কথা এত জিজ্ঞাসা করেন কেন?" তিনি উত্তরে বলিতেন, "আমি ঐ শুভদিনে

মধ্যাহ্নের সময় গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ কাশীক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিব। সেই দিনের আর কত দিন বাকী তাই মা, তোমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করি।"

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা উঠিয়াই তারিণীচরণ তাঁহার পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বৌমা! আজ পৌষ সংক্রান্তি। আমি আজ কিছুই খাইব না, যদি প্রয়োজন বোধ করি তবে কেবল একটু গঙ্গাজল গ্রহণ করিব। তোমার শাশুড়ীর তো মাছ খাওয়া আজই শেষ। একটু ভাল মাছ আনাইয়া আজ তাহাকে খাওয়াও। বেশী দেরী করিও না। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া ফেল। আমার কিন্তু দেহত্যাগের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বেলা অনুমান বারটার সময় তিনি পুত্রবধূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের খাওয়া দাওয়া হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন শাশুড়ী-বৌ তুজনেরই আহারাদি সমাপন হইয়াছে, তখন তিনি পুত্রবধূকে বলিলেন, "বৌমা! আমার তক্তপোষের সম্মুখের জায়গাটা গঙ্গাজল দিয়া মুছিয়া তুইখানা কুশাসন লম্বা করিয়া পাতিয়া রাখ। সময় মত আমি বলিলে আমাকে গঙ্গারদিকে মাথা করিয়া শোয়াইয়া দিও।" শ্বশুরের আদেশানুসারে পুত্রবধূ সব ঠিক করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা! আপনার কথামত স্থানটি গঙ্গাজল দিয়া মুছিয়া তুইখানা কুশাসন পাতা হইয়াছে।" বেলা প্রায় একটার সময় যোগী শ্রীতারিণীচরণ পুত্রবধূকে বলিলেন, "বৌমা! আমাকে একটু ধর আমি চৌকির উপর থেকে নীচে নামিয়া কুশাসনের উপর শুইব। কাহাকেও ডাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি একাই ইহা পারিবে।"

শ্বশুরের আদেশানুসারে পুত্রবধূ তাঁহাকে ধরিয়া কুশাসনের উপর পূর্বশিয়রি করিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন এবং গঙ্গাজল চাহিলে একটু গঙ্গাজলও তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি গঙ্গাজল মস্তকে ও মুখে দিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাংগুষ্ঠিতে পৈত ... তখানা বুকের উপর রাখিয়া জপ করিতে লাগি ... স্থির—চোখের পলক পর্যন্ত পড়িতেছে না ... বস্থা দেখিয়া পুত্রবধূ ভয় পাইয়া শাশুড়ীকে ডাকিলেন। তিনি আহারাদির পর লেপ গায় দিয়া বেশ আরামে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে তাহার স্বামী—একজন সাধারণ সংসারী মানব এইরূপ সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কাশীধামে শরীর ত্যাগ করিতে পারেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি দুর্গামোহনবাবুদের বাড়ীর এবং এই ঘটনা লেখকের বাড়ীর সকলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা সকলে যাইয়া দেখি মহাভাগ্যবান্ যোগী শ্রীতারিণীচরণের বুকের উপর দক্ষিণ হস্তের বুড়ো আঙ্গুলে পৈতা জড়ান এবং দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থির এবং মুখখানি এক দিব্য আনন্দে প্রফুল্লিত। বেলা অনুমান দুই ঘটিকার সময় ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস মন্দিভূত হইতে হইতে একেবারে যেন শরীরের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। সাথে সাথে চক্ষু দুইটিও বন্ধ হইল। গুপ্ত যোগী শ্রীতারিণীচরণের এইভাবে দেহত্যাগ দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া তাঁহার ভাগ্যের উচ্চ প্রসংশা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করার সময় সকলে দেখিল তাঁহার মস্তক হইতে একটি উজ্জ্বল নীল রংয়ের জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আকাশে মিলাইয়া গেল।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্ত ও শিষ্য অর্জুনকে স্পষ্টাক্ষরে

উপদেশ দিতেছেন যোগী তপস্বিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং পুস্তক পঠিত জ্ঞানিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন তথা সকাম কর্মিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥ ৬।৪৬ ॥

যোগী-গুরুর কৃপা ভিন্ন কেহ কখনও যোগী হইতে পারে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে হইলে বিষয়বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ গুরুদত্ত সাধনের আশ্রয় লইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। একবার স্বভাবের যোগপথে পড়িতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। কোন বস্তু স্রোতে ভাসাইয়া দিলে তাহা যেমন স্রোতের বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায় তেমনি গুরু শক্তিই সাধককে চরম স্থানে পৌঁছইয়া দেয়। চাই গুরুর উপর নির্ভরতা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমাদের আলোচ্য গৃহস্থযোগী শ্রীতারিণীচরণের মধ্যে এই দুইটিই পূর্ণরূপে আমরা দেখিতে পাই। তাহা না হইলে কি এমন ভাবে কাশীক্ষেত্রে পূর্ণজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কেহ শরীর ত্যাগ করিতে পারে? মরণকে সাধারণ মানব ভয় করে। কেবল জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগীই মুক্তকণ্ঠে নির্ভয়ে গাহিতে পারে "মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান"।

যাঁহারা সামান্যভাবেও যোগমার্গের কিছু অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন প্রত্যেক মানবদেহে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১৬০০বার সঞ্চরণ করিয়া থাকে। নাসিকাপথে বায়ু গ্রহণের নাম প্রশ্বাস এবং বাহিরে নির্গতের বা নির্গমনের নাম নিঃশ্বাস। ইহা সাধারণতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা নামের

নাড়ীদ্বারা প্রবাহিত হয়। ইড়া নাড়ী বামে এবং পিঙ্গলা দক্ষিণে অবস্থিত। উহাদের যথাক্রমে নাম চন্দ্র ও সূর্য নাড়ী। এই উভয় নাড়ীর মধ্যে আর একটি অতি সূক্ষ্ম নাড়ী আছে যাহা সুষুম্নানামে যোগিগণের নিকট পরিচিত।* মানবশিশু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে মাতার শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেরও নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস চলিতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সাথে সাথে শ্লেষ্মারদ্বারা এই সুষুম্না মার্গটি রুদ্ধ হইয়া যায়। যোগীর ভাষায় বলিলে বলিতে হয় কুণ্ডলিনী মহাভুজঙ্গিনী সুষুম্নাদ্বারে মুখ গুঁজিয়া মূলাধারে নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। সুষুম্নাপথে প্রাণবায়ুর গমনাগমন না হইলে কেহ যোগী হইতে পারে না। এই পথটি খুলিবার বহু উপায় আছে। কেহ তীব্র ভাবনার দ্বারা, কেহ বিশিষ্ট কৌশলে জপের দ্বারা, কেহ প্রাণায়ামের দ্বারা আবার কেহ বা যৌগিকক্রিয়ার দ্বারাও এই সুষুম্নামার্গ উন্মিলন করিয়া থাকেন। গুরু শিষ্যের যোগ্যতা ও আধার বিচার করিয়া বিভিন্ন প্রণালী নির্দেশ করেন।

পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা ও ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণের বৈষম্য হইতেই সৃষ্টি। ইহাদের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হইলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের মধ্যে তরতম বা ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। এই পুরুষ-প্রকৃতিকে শিবশক্তি বা প্রাণ-অপানও বলা যাইতে পারে। প্রতি জীবদেহে প্রাণ ও অপানরূপে বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধ-

* ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না চ সমাহিতা॥
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্যাগ্নিরূপিণী॥

যুক্ত দুইটি শক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাণ ও অপান উভয় উভয়কে আকর্ষণ (Attract) করে আবার সাথে সাথে এক অপরকে বিকর্ষণও (Repulse) করিয়া থাকে। উভয়ে মিলিয়া এক হইতে চায় কিন্তু হইতে পারে না। কারণ প্রাণ যে অনুপাতে জাগিয়া উঠে সেই অনুপাতে অপান সুপ্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অপানের জাগৃতির অনুপাতে প্রাণ নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সুতরাং কোন সময়েই প্রাণ অপান উভয় শক্তি সমজাগ্রৎ না থাকার দরুন পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। অপান বা প্রাণকে জাগাইয়া যদি যথাক্রমে প্রাণ বা অপানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত করা যায় তাহা হইলে অবশ্য উভয়ের সাম্য বা সমতা হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা হয় না। ইহাকে এইভাবেও বলা যাইতে পারে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিদ্বারা প্রাণ যখন নাসিকাদ্বার দিয়া নাভিতে পৌঁছায়, অপান তখন নাভি হইতে মূলাধারে নামিয়া যায়। পক্ষান্তরে অপান যখন মূলাধার হইতে নাভিতে উঠে প্রাণ তখন নাভি হইতে নাসিকাদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইরূপ প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া সদাসর্বদা অষ্টপ্রহরই জীবদেহে চলিতেছে। প্রাণ অপান কখন মিলিত হয় না। যদি অপানকে মুলাধার হইতে নাভিতে উঠাইয়া কোন কৌশলে স্থির রাখিয়া যদি প্রাণকে নাভিতে নামাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উভয়ে মিলিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি প্রাণকে নাভিতে নামাইয়া কোন কৌশলে স্থির রাখিয়া যদি অপানকে মূলাধার হইতে নাভিতে উঠান যায় তাহা হইলেও উভয়ের মিলন হইতে পারে। এই মিলন কণ্ঠে ও ভ্রূমধ্যেও হইতে পারে। উভয় বায়ু মিলিত না হইলে সাম্যাবস্থা লাভ হয়

না। যতক্ষণ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলা-মার্গ ক্রিয়াশীল থাকে। শ্বাস ও প্রশ্বাস মিলিত না হইলে সাম্যাবস্থা লাভ হয় না। সাম্যাবস্থা লাভ না হইলে সুষুম্নামার্গ খোলে না।

এই প্রাণ অপানের মিলনের সংকেত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনকে বলিয়াছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

যোগিগণ অপানে প্রাণের এবং প্রাণে অপানের হবন করিয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হন। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। মোক্ষপরায়ণ মুনি নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমভাবাপন্ন বা সমান করিবেন।

আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই স্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে বাসকরে তখন সে যোগী হইবার দরুন পূর্ব পূর্ব বহু জন্মের ঘটনা সকল তাহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠে। সেই সময় একটি অতি সূক্ষ্মশক্তি মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র ভেদ করিয়া সহস্রার পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত থাকে। এই অবিচ্ছিন্ন শক্তির প্রভাবে জীবের প্রকৃত বিবেক, বৈরাগ্য ও বিচারের উদয় হয়। সে তখন উর্ধ্বপদ ও হেটমুণ্ডে শ্রীভগবানের নিকট অতি কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়, হে ভগবান্! আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু অপকর্ম বা কুকর্ম করিয়াছি যাহার ফলস্বরূপ মাতৃগর্ভের এই ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এই মলমূত্রের ভাণ্ডে

অবস্থানের ফলে কৃমি দংশনে আমার সর্ব শরীর অত্যন্ত ব্যথায় জর্জরিত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমার দয়ায় যদি এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভরূপ কারাগার হইতে একবার নির্গত হইতে পারি তাহা হইলে হে প্রভো! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছে, এমন কুকর্ম আর করিব না যাহার ফলে পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিতে হয়। সর্বতোভাবে—কায়-মনো-বাক্যে হে দয়াল! তোমার ভজনা করিব। এই প্রকার কাতর প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞার সাথে সাথে ভগবৎ-কৃপায় মাতৃগর্ভস্থ প্রসূতি নামক বায়ু ধাক্কা দিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহিরে নিঃসৃত করিয়া দেয়। এই আঘাতের ফলে সেই যে একটানা সূক্ষ্মশক্তি যাহা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাহা তিন স্থানে ছিন্ন হইয়া যায়। প্রথম ছিন্ন হয় নাভিস্থানে, দ্বিতীয় কণ্ঠে এবং তৃতীয় ভ্রূমধ্যে। তিন জায়গায় ছিঁড়িয়া যাওয়ায় চারিটি খণ্ডে পরিণত হয়। এই অখণ্ড-শক্তি খণ্ডিত হওয়ায় গর্ভস্থ জীবের কাতর প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা এবং স্মৃতি সব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মহামায়ার মায়ারূপ মোহনিদ্রায় জীব আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই চারিটি ছিন্ন অংশকে আবার এক করিতে পারিলে পুনরায় পূর্ণজ্ঞানের উদয় এবং বহু প্রকার যোগজশক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তির প্রভাবেই যোগী নানা প্রকার অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হন এবং নিজের কিংবা অপরের মৃত্যুর দিন, সময় ও স্থান বলিতে পারেন। আমাদের আলোচিত গৃহস্থ-যোগী শ্রীতারিণীচরণ তাঁহার গুরুর কৃপায় এবং নিজের সাধনার দ্বারা এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তিন মাস পূর্বে বলিতে পারিয়াছিলেন কাশীতে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি তাঁহার মরদেহ

পরিত্যাগ করিয়া বাবা শ্রীবিশ্বনাথের চরণে চিরনির্বাণ গ্রহণ করিবেন। যোগী ব্যতীত কেহ এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। সেই জন্যই যোগীর স্থান সর্ব শাস্ত্রে এত ঊর্ধ্বে রাখা হইয়াছে। জ্ঞানী ও ভক্তেরও এই শক্তি হয় তবে তাঁহারা ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

—:::—

অজ্ঞাত বনকুসুম

অষ্টম কুসুম

তপস্বিনী শ্রীমতী গঙ্গাদেবী

আজ হইতে প্রায় সত্তর বছরের পুরাতন কথা। এই প্রবন্ধ লেখকের বাল্যাবস্থায় তাহাদের কাশীর খালিসপুরার বাড়ীতে একজন গেরুয়াবস্ত্র পরিধানা শ্যামবর্ণা, খর্বাকৃতি, বিধবা স্ত্রীলোক হাতে পিতলের কমণ্ডলু লইয়া কখন-সখন আসিতেন। বয়স তাঁহার সেই সময় ছিল অনুমান ষাট বৎসর। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, গলায় ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র। তিনি শরীরে কখন যে তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হইত না এমনই ছিল রুক্ষ এবং খসখসে। পরিবার কাপড়খানা তিনি এমন-ভাবে জড়াইয়া পরিতেন যে মুখ, দুইখানি হাত ও পা ব্যতীত

আর শরীরের কোন অঙ্গই দৃষ্টিগোচর হইত না। অথচ তিনি জামা, সেমিজ কিংবা সায়াও ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার শরীর হইতে অপূর্ব একপ্রকার সুগন্ধ নির্গত হইত, যাহার লোভে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সেই দিব্যগন্ধ উপভোগ করিবার মানসে তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তিনি তাঁহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিতেন তথাপি বালক বালিকারা তাঁহার শরীরের গন্ধের আকর্ষণে তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারিত না। এমনই ছিল তাঁহার আকর্ষণী শক্তি। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তিনি কদাচিৎ আমাদের বাড়ী আসিতেন। বাড়ীর কাহারও জ্বর হইলে তিনি সন্ধ্যার সময় শ্রীবটুকভৈরবের স্তোত্র পাঠ করিয়া তিন দিন ঝাড়িয়া দিলে যে জ্বর ছাড়িয়া যাইত ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় গঙ্গার ঘাটে কিংবা কোন দেবতার মন্দিরে বসিয়া জপ, ধ্যান করিতেন, কখন-সখন দুই এক পরিচিত গৃহস্থের বাড়ী যাইতেন। তাহাও খুব অল্প সময়ের জন্য। কিছু ফলমূল শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন।

তপস্বিনী শ্রীগঙ্গাদেবীর জীবন সম্বন্ধে যাহা আমরা সেই সময় শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছি। তাঁহার জন্মস্থান ছিল পূর্ববঙ্গের বর্তমানে বাঙ্গলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জিলার কোন এক অতি ক্ষুদ্রগ্রামে। পিতামাতা উভয়ে খুবই ধার্মিক ছিলেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রামের পূজা সেবায় তাঁহাদের অধিক সময় অতিবাহিত হইত। পিতা ছিলেন অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচান্তে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পন ও দেবসেবায় দ্বিপ্রহর কাটাইতেন। পৌরোহিত্য-ব্যবসায়

দ্বারা তাঁহার সংসারযাত্রা অত্যন্ত কায়ক্লেশে নির্বাহ হইত। বালিকা গঙ্গাদেবী ভোরে উঠিয়া পিতার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, বিল্বপত্র আহরণ, চন্দনঘর্ষণ ইত্যাদি করিয়া রাখিতেন। পিতা তুলসী তুলিয়া নিত্য শালগ্রাম, শিব ও ইষ্টপূজা করিতেন। মেয়েদের তুলসী চয়ন করিতে নাই বলিয়া পিতা এই কাজটি নিজেই করিতেন। এই সব শিক্ষা ছোট বেলা হইতে গঙ্গাদেবী পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন পিতা স্নান করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পূজার জন্য তুলসী সংগ্রহ করিতেন। পিতা তাহাকে তুলসী চয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদেবীর একটি মাত্র ছোট ভাই। তাহার নাম ছিল নকুল। নকুল ছিল গঙ্গা হইতে পাঁচ বছরের ছোট। ক্ষুদ্র গ্রাম সেখানে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন পাঠশালা না থাকায় পিতাই পুত্রকন্যাকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়াছিলেন। দিন কি ভাবে অতিবাহিত হইবে তাহার আভাস প্রত্যূষেই পাওয়া যায়। কপালে লিখিত দুঃখ কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। অকস্মাৎ গ্রামে মহামারী দেখা দিল। গঙ্গা ও নকুলকে অকূল-পাথারে ভাসাইয়া তাহাদের মাতা, পিতা কয়েকদিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। পিতা মৃত্যু-সময় ছেলেমেয়েকে তাহাদের জেঠামহাশয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া যান। যখন পিতামাতার মৃত্যু হয় তখন গঙ্গার বয়স এগার এবং নকুলের বয়স ছিল ছয় বৎসর। বৃদ্ধা পিসিমা ও জেঠাইমা তাহাদের লালন পালন করিতেন। সেই সময়কার বঙ্গদেশের সমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে মেয়েদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ হইত। জেঠামহাশয় গঙ্গার বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত, সাথে

সাথে পিসিমার দুইবেলা তাগিদেরও বিরাম নাই। অগত্যা একটি বেশী বয়সের রুগ্ন পালটি ঘরের পাত্র পাইয়া জেঠামহাশয় গঙ্গাকে তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। তাহাদের খাওয়া পরার কোন অভাব নাই। পৈতৃক খেত খামার, পুকুর বাড়ী, গরু বাছুর, লাঙ্গল বলদ ইত্যাদি সবই আছে এবং বাড়ীতে কয়েক ঘর শরীক ও বর্তমান। বিবাহের পর যে গঙ্গাদেবী শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন তাহার পর পিত্রালয়ে আর বড় আসেন নাই। ছোট ভাই নকুলকে তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। জেঠামহাশয়ের কাছে নকুলের পড়া-শোনার কোন সুব্যবস্থা হইবার আশা নাই দেখিয়া একবার পিত্রালয়ে গিয়া গঙ্গাদেবী ছোটভাইকে তাহার নিকট লইয়া আসেন। নকুল দিদির কাছে থাকিয়া গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে লাগিল। গ্রামে যতটা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়া শোনা করা সম্ভব ছিল, ততটাই তাহার বিদ্যা।

গঙ্গাদেবীর পতিগৃহে দুইজন কি তিনজন বিধবা স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কোন পুরুষই ছিল না। বাড়ীর অন্য শরীকদের সাহায্য ছাড়া উঁহাদের সংসার চলা কঠিন ছিল। গঙ্গাদেবীর স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি স্বয়ং চাষবাস দেখিতে পারিতেন না, বাড়ীর অন্য অংশীদারদের উপর নির্ভর করিতে হইত। গঙ্গাদেবীর বয়স যখন অনুমান আঠার কি কুড়ি তখন তাহার স্বামীর রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়। যিনি তাহার চিকিৎসা করিতেন তিনি একদিন স্পষ্ট বলিলেন যে এই ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে। যদি তাহাদর ইচ্ছা হয় অন্য চিকিৎসক দেখাইতে পারেন। এই কথা শুনিয়া গঙ্গাদেবীর পতি তাহার পত্নীকে

বলিলেন, "আমি যখন বাঁচিবই না, এমতাবস্থায় তুমি আমাকে কশী লইয়া চল। আমি কাশীতেই যাইয়া মরিব। শুনেছি কাশীতে মরিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

গঙ্গাদেবী বড়ই পতিপরায়ণা। পতির আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। পতির আজ্ঞাই ছিল তাঁহার নিকট বেদবাক্য, গুরুবাক্য। তখনকারদিনে পতিই ছিলেন পত্নীর পরমগুরু। পতিসেবার দ্বারাই যে স্ত্রীলোকের সকল অভিষ্ট লাভ হইতে পারে ইহা তিনি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করিতেন। পতির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আজ গঙ্গাদেবী কৃতসংকল্প। পতির নিকট কিছু টাকা ছিল আর কিছু ধানের জমি বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ হইল। ঐ টাকা সম্বল করিয়া তিনি বরিশাল হইতে ছোট ভাই নকুলকে লইয়া স্বামীসহ গ্রামের এক দূর সম্পর্কিত আত্মীয়ের সহিত সুদূর অজানা কাশীর উদ্দেশ্যে বাবা শ্রীবিশ্বনাথের নাম স্মরণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় কতখানি মনে সাহস, চরিত্রবল এবং ভগবানে নির্ভরতা থাকিলে একজন গ্রামের অশিক্ষিতা যুবতী নারী স্বীয় আসন্ন -মৃত্যু পতি ও নাবালক ভ্রাতাকে লইয়া অপরিচিত দূর দেশে গমন করিতে উদ্যত হইতে পারেন। ইহা কেবল সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব। সতী নারীকে স্বয়ং মৃত্যুও ভয় করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে সাবিত্রীর পক্ষে কি মৃতপতি সত্যবানকে যমের হাত হইতে ছিনাইয়া আনা সম্ভব হইত ?

কিছু নৌকায়, কিছু ষ্টিমারে (জাহাজে) এবং কিছু রেলে যাত্রা করিয়া অবশেষে পতির ঈপ্সিত বারাণসীধামে আসিয়া মহাতেজস্বিনী শ্রীগঙ্গাদেবী উপস্থিত হইলেন। বাবা শ্রীবিশ্বনাথের চরণে

পতিসহ চিরদিনের জন্য তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পথে আসিতে আসিতে তিনি বিশ্বনাথের পাদপদ্মে একান্তভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতে ছিলেন তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহার অভয়চরণে এই দীন দুঃখিনী অনাথিনী সন্তানকে একটু স্থান দেন। শ্রীশ্রী বাবা বিশ্বনাথের অপার করুণায় তাঁহার অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধামে বাস হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপা না হইলে কেহ তাঁহার প্রিয় বারাণসীতে বাস করিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে প্রথমে তো মানবের কাশীবাসের জন্য মনে বাসনারই উদয় হয় না, হইলেও নানাপ্রকার বাধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ভাগ্যে কাশীবাসের সুবিধা হইয়া উঠে না।

আশ্রয়হীনা গঙ্গাদেবী তাঁহার মুমূর্ষু পতি ও ছোট ভাইসহ কাশীতে আসিয়া প্রথম দশাশ্বমেধঘাটে নামিলেন। কোথায়, কাহার বাড়ী কেমন করিয়া স্থান পাইবেন তাহার কোনই ঠিক ঠিকানা নাই। যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকেন তাঁহার সকল ভার যে তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

গঙ্গার পারে বসিয়া যখন তিনি অনোন্যোপায় হইয়া বাবা বিশ্বনাথকে ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছিলেন এমন সময় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অযাচিতভাবে গঙ্গাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কোথায়, কাহার বাড়ী যাইবে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি এই রুগ্ন পতি ও ছোট ভাইটিকে লইরা সুদূর বরিশাল হইতে

কাশীবাসের জন্য বাবা বিশ্বনাথের চরণে আসিয়াছি। এখানে আমার পরিচিত কোন লোক নাই, যাহার আশ্রয়ে গিয়া উঠিতে পারি। তাই বাবা! গঙ্গার পারে স্থান লইয়াছি। দেখি, বাবা বিশ্বনাথ দয়া করিয়া কোন উপায় করেন কি না!" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "মা, আমার এখানে বাড়ী আছে। তুমি ইচ্ছা করিলে সেখানে উঠিতে পার। আমার বাড়ী এখান হইতে খুবই নিকটে।"

অগতির গতি শ্রীভগবান্। অযাচিতভাবে তিনি এভাবে যে এত শীঘ্র আশ্রয় পাইবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথই কৃপা করিয়া এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাহার বাড়ীতে স্থান দিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন, নচেৎ তিনি কেন সাধিয়া এই অপরিচিতা দুস্থা রমণীকে দিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিবেন। গঙ্গাদেবী অকূল সাগরে নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিতেছিলেন। হঠাৎ আশাতীতভাবে বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। রুগ্ন স্বামী ও ছোট ভ্রাতাকে লইয়া গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণের সাথে তাহার খালিসপুরার বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী বাস করেন এবং তিনি একজন অতি সদাশয় ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাড়ীর একখানা ঘর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কাশীবাস করিতে হইলে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু বিনা বিনিময়ে গ্রহণ করা নিষেধ বিধায় তিনি ব্রাহ্মণকে মাসিক কিছু ঘরভাড়া দিবেন স্বীকার করিলেন। পক্ষান্তরে তিনিও উহা লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। গঙ্গাদেবীকে কাশী পৌঁছাইবার কয়েক দিন পর সেই গ্রামবাসী আত্মীয়টি স্বগ্রামে

ফিরিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে তিনি গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিয়া লইলেন। আজ শ্রীগঙ্গাদেবী বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তাঁহার চরণে পতি ও ভাই নকুলকে লইয়া চিরদিনের জন্য আশ্রয় পাইলেন।

প্রথম প্রথম কাশী আসার আনন্দের কারণেই হউক অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই হউক গঙ্গাদেবীর স্বামী একটু সুস্থ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেবল দুধসাবু ও দুধবার্লি খাইতে খাইতে আমার মুখে অত্যন্ত অরুচি হইয়াছে। আর ঐ সব খাইতে ভাল লাগে না। আজ আমার মাছের ঝোল ভাত খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। তাড়াতাড়ি আজ আমাকে মাছের ঝোল ভাত রান্না করিয়া খাওয়াও।" পতির কথামত গঙ্গাদেবী বাজার হইতে মৎস্য আনাইয়া রাঁধিয়া তাড়াতাড়ি থালায় ভাত বাড়িয়া স্বামীকে ভোজন করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী মনে করিলেন স্বামী বুঝি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। বার বার ডাকিয়াও যখন কোন প্রকার সাড়া শব্দ পাইলেন না, তখন তিনি বাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন তো বাবা, রান্না করিয়া খাবার জন্য এত ডাকিতেছি উনি কোন প্রকার সাড়া দিতেছেন না কেন ? এই তো আমি তাড়াতাড়ি করিয়া ওনার জন্য মাছের ঝোল ভাত রান্না করিয়া আনিয়াছি। কখন উনি খাইবেন ?" ব্রাহ্মণ বহু ডাকাডাকির পর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "মা, কে আর মাছের ঝোল ভাত খাইবে ? তিনি সংসারের মায়া মমতা সব ত্যাগ করিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণে লয় হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।"

বাড়ীওয়ালা ব্রহ্মণের মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে পতির মৃত্যুর সংবাদে গঙ্গাদেবী দুঃখে শোকে একেবারে মোহ্যমান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। দুঃখ এই জন্য যে স্বামী ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না এবং শোকের কারণ এই যে চিরদিনের মতন প্রিয়তম পতিদেবতাকে হারাইলেন। এত শীঘ্র যে তিনি চলিয়া যাইবেন ইহা তিনি আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয় তো বা আরও কয়েকটা দিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন কারণ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্য একটু ভালর দিকে যাইতেছিল। দীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে যেমন একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তেমনি তিনি পরলোকে গমন করিবার আগে একটু ভাল বোধ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি পতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি যথাবিধি করার পর যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইলেন। পতির শ্রাদ্ধের পূর্বে দশম দিবসে তিনি যে মস্তক মুণ্ডন করাইলেন তার পর আর জীবনে কখনও কেশ রাখেন নাই। সন্ন্যাসীর মত প্রত্যেক মাসে মাসে তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইতেন

আর একটি বিশেষ কথা এই স্বামী মৃত্যুর পূর্বে ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পতির অন্তিম বাক্য রক্ষা ও তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া সেই দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর কখনও তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের ঘোর পরিবর্তন আরম্ভ হইল পতির মৃত্যুর দিন হইতে। একটা নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে লোকের জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্য বড় আসে না। যাঁহাদের সেইরূপ আসে তাঁহারা প্রকৃতই মহাভাগ্যবান।

গঙ্গাদেবী বাল্যকাল হইতে কখনও সুখের মুখ ভুলেও দেখেন নাই। দুঃখে দুঃখেই তাঁহার এতদিন কাটিয়াছে। সংসারে যে বাস্তবিক সুখ নাই ইহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে যে জীবনে সুখ-শান্তি আসিতে পারে না ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু হইতে আসক্তি ছিন্ন করিয়া ভগবানের উপর তীব্র অনুরাগ প্রয়োজন। জগতের উপর হইতে যেমন যেমন আকর্ষণ কম হইতে থাকে তেমন তেমন শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। জীবনে অভাব যাঁর যত অল্প তিনি ইষ্টচিন্তার জন্য সময় ও সুযোগ তত অধিক পাইয়া থাকেন। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ছোট ভাই নকুলকে এক ভদ্র পরিবারে রাখিয়া পড়াশোনার ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ইষ্টপ্রাপ্তির মানসে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি দৈনন্দিন দিনচর্যারদ্বারা জীবনকে এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলিলেন যে ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তার আর তাঁহার অবকাশ রহিল না।

দেখা যায় মানুষের জীবনে আকর্ষণের বস্তু চারিটি। প্রথম আসক্তি হয় ব্যক্তির উপর, দ্বিতীয় স্থানের উপর, তৃতীয় বস্তুর উপর এবং চতুর্থ অবস্থার উপর। ইহার মধ্যে গঙ্গাদেবীর আকর্ষণের কোনটাই নাই। নারীর পতির উপর অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা একটু স্নেহ ছোট ভাই নকুলের উপর অবশিষ্ট ছিল তাহাও তিনি তাহার অন্যত্র রসবাসের ব্যবস্থা করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তু, স্থান ও অবস্থার উপর আসক্তির মূলচ্ছেদ তো বহুদিন পূর্বেই একেবারে হইয়া গিয়াছে।

আধ্যাত্মিক পথের যে সব অন্তরায় সে সব হইতে আজ গঙ্গাদেবী অব্যাহতি পাইয়াছেন। এখন তিনি মুক্তি পথের একজন প্রকৃত যাত্রী। তাঁহাকে বাঁধিবার আর কেহ এখন নাই। গঙ্গাদেবী এখন নীলাকাশের একটি উড়ো পাখী।

তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং কেদারনাথ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাদি সব দেবতা দর্শনকরতঃ মন্দিরে মন্দিরে জপ করিতেন। প্রাতেঃ কেদার ঘাটে, মধ্যাহ্নে মনিকর্ণিকায় এবং সায়াহ্নে দশাশ্বমেধঘাটে প্রতিদিন তিনবার স্নান সন্ধ্যা ও জপ তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। সমস্ত দিন কিছুই, এমন কি জল পর্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। সন্ধ্যার পর ঘরে আসিয়া সামান্য কিছু ফল-মূল ও কন্দ (মিষ্টি আলু) সিদ্ধ এবং একপোয়া পরিমাণ দুগ্ধ ছিল তাহার আহার। লবণ কিংবা মিষ্টি খাইতেন না। তিনি একাদশী, শিবরাত্রি, রামনবমী, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী প্রভৃতি সনাতনধর্মাবলম্বী আস্তিক হিন্দুদের সকল ব্রতোপবাস নিরম্বু থাকিয়া পালন করিতেন। এইভাবে কঠোর কৃচ্ছসাধনদ্বারা তিনি শরীরকে অল্পদিনের মধ্যেই শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিত্য গঙ্গা, সূর্য, আদ্যা, বটুকভৈরব, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার স্তোত্র পাঠ করিতেন। এই সব স্তবস্তুতি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সাথে সাথে তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীগুরুগীতা ও শ্রীরামগীতা নিয়মিত ভাবে নিত্য পাঠ করিতেন। তিনি রাত্রি বারটা হইতে তিনটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। শয্যা ছিল গরমের সময় কুশাসন এবং শীতের সময় কম্বল। তিনি কখনও বালিশ ব্যবহার করিতেন না। বলা বাহুল্য তিনি ভূমিতেই শয়ন করিতেন, তক্তাপোশের

উপর শয়ন তাঁহার সদাই বর্জিত ছিল। নিদ্রার তিনঘণ্টা সময় বাদে অবশিষ্ট সময় স্বীয় সাধন-ভজন ও জপ-আরাধনা নিয়াই থাকিতেন। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শ্রীগুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপই ছিল তপস্বিনী গঙ্গাদেবীর প্রধান সাধন। এই সাধন তাঁহার রাত্রি নয়টা হইতে বারোটা এবং রাত্রি তিনটা হইতে ভোর ছয়টা পর্যন্ত অটুটভাবে চলিত।

লোকের সহিত ব্যবহার তিনি কম করিতেন এবং কথাবার্তাও স্বভাবতঃ তিনি কমই বলিতেন এবং অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেন। তাঁহাকে অসুখে পড়িতে কেহ কখনও দেখে নাই। তাঁহার শরীর হইতে যে সর্বদাই একটা অতি সুগন্ধ নির্গত হইত তাহা প্রথমেই লেখা হইয়াছে অথচ তিনি পরিবার কাপড়খানা গঙ্গাজলে ধৌতকরা ছাড়া কখনও সাবান কিংবা সোডা দিয়া পর্যন্ত কাঁচিতেন না। ধোপার বাড়ী কাপড় দেবার তো কথাই বাহুল্য। যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন—

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবিত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥২।১৩

"শরীরের লঘুতা, শরীর ও মনের রোগহীনতা, বিষয়ে লোভরাহিত্য, দেহের উজ্জ্বল কান্তি, স্বরমাধুর্য, দেহের মধুর গন্ধ, মলমূত্রের স্বল্পতা—এই সকলকে যোগিগণ যোগসিদ্ধির পূর্বভাবী চিহ্ন বলিয়া থাকেন।" উপরোক্ত লক্ষণগুলি অধিকাংশই তপস্বিনী শ্রীগঙ্গাদেবীর মধ্যে দেখা যাইত যথা শরীর ও মনের রোগহীনতা, লোভহীনতা, মধুরস্বর, মধুরগন্ধ এবং মুখে সর্বদা একটা প্রসন্ন গম্ভীরভাবের সহিত সরলতা। এই সকল যোগসিদ্ধির লক্ষণ হইতে মনে হয় তিনি অজপাসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অজপা সম্বন্ধে যোগ তথা তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে মানবদেহে প্রাণশক্তি নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। এই শ্বাস বহির্গমনকালে 'হং'-রূপে এবং ভিতরে প্রবেশকালে 'সঃ'-রূপে ধ্বনিত হয়। ইহাই হংসঃ মন্ত্র বা অজপা নামক গায়ত্রী। প্রত্যেক মনুষ্যই সুস্থশরীরে অহোরাত্রে ২১৬০০বার ইহা স্বাভাবিকভাবে জপ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুর কৃপাতে যোগ প্রাপ্ত হইলে ঐ জপ সুষুম্না-মার্গে বিপরীতভাবে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ 'হংসঃ' তখন 'সোহং' রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। স্বভাবতঃ হংসঃ মন্ত্র মানবের অজ্ঞাতসারে সদাসর্বদা ইড়া কিংবা পিঙ্গলা নাড়ীতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। সুষুম্নাপথ জন্মের সাথে সাথেই রুদ্ধ হইয়া যায়। যোগীগুরুর নিকট হইতে এই পথ খুলিবার সংকেত জানিতে হয়। সকল প্রকার সাধনার মধ্যে অজপা সাধনকে সহজ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া একবাক্যে সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। মনকে একাগ্র করিবার ইহা একটি উত্তম এবং সহজাত উপায়।

অজপানামগায়ত্রী যোগিনাং সিদ্ধিদামতা।
হংসপদং মহেশানি প্রত্যহং জপতে নরঃ ॥ ১ ॥
মোহাদ্ যো বৈ ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে।
অজপাং জপতো নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥
হকারেণ বহির্যান্তং বিশন্তং চ সকারতঃ।
চিন্তয়েৎ পরমেশানি জীবন্তং পক্ষিরূপিণম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা।
উশ্বাস নিঃশ্বাস তয়া বন্ধ মোক্ষ স্তদাভবেৎ ॥ ৪ ॥
অস্য হংসস্য দেবেশি নিগমাগমপক্ষকৌ।

উভাবপি চাগ্নিসোমৌ বক্ষো হংস শিরোভবেৎ ॥ ৫ ॥
বিন্দুস্ত্রয়ং শিখানেত্রে মুখং নাদঃ প্রকীর্তিতঃ।
শিবশক্তী পদদ্বন্দ্বং কালাগ্নি পার্শ্বযুগ্মকম্ ॥ ৬ ॥
হংসঃ পরমহংসোঽহয়ং সর্বব্যাপি প্রকাশবান্।
সূর্য কোটি প্রকাশশ্চ স্বপ্রকাশেন ভাসতে ॥ ৭ ॥

অর্থ

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় অর্ধাঙ্গিনী মহাদেবী পার্বতীকে বলিতেছেন। অজপা নামক গায়ত্রী যোগিগণের সিদ্ধি প্রদানকারী। হে মহেশানি! এই হংসঃ মন্ত্র প্রতিদিন মানব (২১৬০০বার) জপ করিয়া থাকে। অজ্ঞানবশতঃ যাহারা ইহা জানে না তাহাদের মুক্তি হয় না। আর যাহারা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নিত্য এই অজপা মন্ত্র জপ করে তাহাদের পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হকারদ্বারা শ্বাস বাহিরে গমন করে এবং সংকারদ্বারা প্রশ্বাস ভিতরে যায়। হে পরমেশ্বরি! ইহাকে একটি জীবন্ত পক্ষীরূপে চিন্তা করিবে। হে দেবি! শ্রীগুরুর কৃপায় যাহারা ইহা জ্ঞাত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করে তাহারা সংসার বন্ধন হইতে সদার জন্য মুক্ত হইয়া যায়। হে দেবেশি! এই হংসরূপ পক্ষীর নিগম এবং আগম অর্থাৎ বেদ ও তন্ত্র দুইটি পক্ষ বা ডানা। অগ্নি ও সোম এই পক্ষীর বক্ষ ও শিরে অবস্থান করিয়া হংস নামক পক্ষীকে রক্ষা করে। তিনটি বিন্দু অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, দুই নেত্র এবং ভ্রূমধ্যে স্থিত এবং মুখে নাদরূপে ইহার স্থান। শিব ও শক্তি এই পাখীর দুইটি পা এবং দুই পার্শ্বে কালাগ্নি অবস্থিত। এই হংসরূপ জীবই পরমহংসরূপ আমি কোটি সূর্যের সমান প্রকাশমান হইয়া স্বীয়

প্রকাশদ্বারা সম্পূর্ণ জগৎ আলোকিত করিতেছি।

শাস্ত্রে তপস্যার মাহত্ম্য বহু বর্ণিত হইয়াছে। বলা হয় ব্রহ্মা তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করিতেছেন, বিষ্ণু তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি পালন করিতেছেন এবং রুদ্র তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি সংহার করিতেছেন। মহারাজা মনু ও মহারাণী শতরূপার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্‌কে তাঁহাদের ঘরে পুত্ররূপে আসিতে হইয়াছিল। তপস্যার প্রভাবেই দেবরাজ ইন্দ্র দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলন। উপনিষদের যুগে দেখা যায় গুরু শিষ্যদ্বারা পূর্ণ তপস্যা করাইয়া তবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেন। তপস্যার দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান ধারণ করা যায় না। তাই তপস্যার এত মাহত্ম্য। ঋষিদের যে এতসম্মান তাহা তাঁহাদের তপস্যার ফলেই। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যাদি না থাকিলে মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ সাধনে জীব কৃতকার্য হইতে পারে না।

জন্ম-তপস্বিনী গঙ্গাদেী সুদীর্ঘ অনুমান ষাট বৎসর কাশীবাসকরতঃ প্রায় আশী বৎসর বয়সে জপ করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদির পর গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একদিন দেখা গেল সূর্যোদয়ের অনেক পর পর্যন্ত গঙ্গাদেবীর ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরও যখন তাঁহার কোন সাড়াশব্দ মিলিল না, তখন তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া সকলে দেখিল তাঁহার সাধনার আসনে বসিয়া তিনি মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করিয়াছেন। যোগী ব্যতীত কেহ বসিয়া দেহত্যাগ করিতে পারে না। মহাতপস্বিনী শ্রীগঙ্গাদেবী যে কত উচ্চস্তরের

সাধিকা ছিলেন তাহা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেহ বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার শরীরত্যাগর ভঙ্গি দেখিয়া সকলে এক বাক্যে তাঁহার পবিত্র জীবন ও তপস্বার ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিল।

তিনি কখনও কাহারও নিকট অর্থ যাচনা করিতেন না। তিনি এক ব্রাহ্মণের নিকট চারিশত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক মাসে মাসে তিনি তাঁহাকে ঐ টাকার স্নুদের বাবদ চারিটাকা দিতেন। এই চারি টাকার দ্বারাই তিনি ঘর ভাড়া ও গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। নিশ্চিন্তভাবে সাধন ভজনের ইহা তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা তাঁহার ছোট ভাই নকুলকে দিবার জন্য তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ টাকার দ্বারা নকুলবাবু তাহার দিদির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি যথাশাস্ত্র করেন।

একজন অতি সাধারণ নারী কি ভাবে নিজের চেষ্টায় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিয়া তুর্লভ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন তাহা আমরা তপস্বিনী শ্রীগঙ্গাদেবীর জীবন আলেখ্য হইতে পাই। এ জাতীয় তপস্বীর কঠোর সংযমী জীবন বর্তমান যুগে বড় একটা দেখা যায় না। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রতিমূর্তি শ্রীগৌতমবুদ্ধ সাধনায় বসিবার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “ইহাসনে শুশ্বতু মে শরীরং, তগস্থি মাংসং প্রলয়ং মে যাতু।” ভগবান্ শ্রীতথাগত ব্যতীত এমন প্রতিজ্ঞা আর কে করিতে পারে, ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন’। ইহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে দেখা যায় আমাদের আলোচ্য তপস্বিনী শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর আদর্শ জীবনবেদে।

— ::: —

অজ্ঞাত বনকুসুম

নবম কুসুম

আদর্শ গুরুভক্ত মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অবস্থাপন্ন পিতা শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে জন্ম, ভূমিষ্ঠ হইতেই সুখে লালিত-পালিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং সুপ্রসিদ্ধ ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একনিষ্ঠ নবীন যুগপ্রবর্তক, ঋষিকল্প মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত বর্তমান-যুগের অনেকেই পরিচিত নহেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রকারে ভারতীয় স্বতন্ত্রতার যথার্থ ঋত্বিক বা প্রধান নেতা এবং বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ মূল নিয়ামক বা পরিচালক। যিনি জীবনে কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই বা যাঁহার শরীরে অজ্ঞাতসারেও কখনও অভাবের বাতাস লাগে নাই, তিনিই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর যোগী শ্রীঅরবিন্দকে সহকর্মীরূপে সাথে লইয়া স্বেচ্ছায় দুঃখবরণকরতঃ দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার সতীর্থদের

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিশ্ববরেণ্য স্বনামধন্য সার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উৎসব পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক নীতিবিদ্ ও আদর্শবাদী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামদয়াল মজুমদার, তীক্ষ্ণ মেধাবী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ মহাশয়ের পিতা), বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ভারতীয় শাখার প্রথম ও প্রধান সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি মনীষীগণ। মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্র ছিলেন চির কুমার এবং একজন আদর্শ প্রকৃত ব্রহ্মচারী। তাঁহার আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দির প্রসিদ্ধ ধর্মনেতা ও ভগবৎভক্ত মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়। যিনি তৎকালে 'জটীয়াবাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্র ছিলেন সকলপ্রকারে একজন অতিশয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। জীবনের প্রথম হইতেই তিনি ছিলেন এক মহান্ অজ্ঞেয়বাদী। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে অপর কোন কিছুর অস্তিত্ব বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কোন সাধু মহাত্মাকে অনুসরণ করা ছিল তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তিনি স্বীয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা যাহা নিশ্চয় করিতেন তাহাই মানিতেন, অপরের প্রদত্ত পরামর্শ বড় গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচারের উপর ছিল তাহার অত্যধিক প্রত্যয়। তিনি সেইযুগের একজন প্রকৃত আদর্শ মানবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবল, চরিত্রবল এবং নৈতিক-উৎকর্ষ

ছিল অতুলনীয়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কেবল সমকালীনই ছিলেন না, তাঁহার সহিত সতীশচন্দ্রের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল। তথাপি তিনি কখনও ইচ্ছাপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শনের জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন নাই। যদ্যপি তাঁহার জীবনে বহুবার ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়াছিল। এমনই ছিল শ্রীসতীশবাবুর সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী ও মহাত্মাদের প্রতি একটা অতি তীব্র উদাসীনতা। পবিত্র নৈতিক-জীবন যাপন, বিদ্যার অনুশীলন ও দশের এবং দেশের সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য আদর্শ। নীতিপরায়ণ জীবনদ্বারাই যে সর্বোত্তম অভীষ্ট-লাভ হইতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত।

তাঁহার জীবনে সবথেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হইল তাঁহার গুরু-প্রাপ্তি। তিনি অভাবনীয় ও বিচিত্ররূপে গোস্বামীপাদ শ্রীবিজয়-কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িয়া যান তথা অলৌকিক ভাবে তাঁহার জীবনে সহসা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ অবস্থান্তর যে কখনও তাঁহার জীবনে ঘটিতে পারে তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের গর্ভে কাহার জন্য কি যে বিধাতা পুরুষ লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। মহাত্মা শ্রীবিজয়কৃষ্ণের একজন শিষ্য ছিলেন সতীশবাবুর বিশেষ বন্ধু। কোনপ্রকারে বন্ধুকে শ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত করার একটা তীব্র অভিলাষ তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন। সতীশচন্দ্রের ন্যায় এমন পবিত্রাত্মার হৃদয়ে ধর্মভাবের সঞ্চার হয় ইহা বন্ধু তাঁহার শ্রীগুরুর চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি

তাঁহার একান্ত মনোগত বাসনা স্বীয় গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে সুবিধামত একদিন নিবেদন করাতে গোসাঁইজী আদেশ করিলেন, "আগামী কাল সতীশকে আমার নিকট আসিতে বলিও।" বন্ধু সতীশবাবুকে গোস্বামী প্রভুর আদেশ জানাইলেন, কিন্তু তিনি কোন মতেই তাঁহার কাছে যাইতে সম্মত হইলেন না। সেই দিন এই পর্যন্তই কথা হইয়া রহিল।

পরের দিন সতীশবাবু অনুমান করিলেন হয় তো বন্ধু তাহাকে শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবার জন্য আসিতে পারেন। এই আশঙ্কায় তিনি অতি প্রত্যূষেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, যাহাতে বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা না হয়। তাঁহার মনোগত ভাব ছিল কোন প্রকারে প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার না হয় এবং বন্ধু তাঁহাকে গোসাঁইজীর বাড়ী লইয়া যাইতে না পারেন। তাঁহার ভয় ছিল, মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে হয় তো তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে না যাইয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়! না জানি কোন অচিন্ত্য শক্তির ইঙ্গিতে তিনি ভুল করিয়া, বিভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে, পিপাসায় কাতর হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সম্মুখে যে বাড়ী তিনি দেখিতে পাইবেন সে বাড়ী হইতেই একটু জল চাহিয়া পানকরতঃ তাহার পিপাসা নিবৃত্তি করিবেন। সে সময় তাহার মনের অবস্থা

স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। তিনি অনুমান করিতে-ছিলেন তিনি যেন যন্ত্রচালিতের ন্যায় সামনে অগ্রসর হইতেছেন। ইত্যবসরে তিনি এক বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন একটি যুবক সেই বাড়ীর দরজায় বসিয়া আছে। যেন কাহারও জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

সতীশবাবু—আমি বড়ই পিপাসিত। একটু জল দিবে ?

যুবক—আমার সাথে উপরে চলুন। আপনি জল পাইবেন। আমি আপনারই অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছি।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবকটি তাঁহাকে লইয়া একতালার একটি ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া তিনি দেখিলেন একখানা আসন পূর্ব হইতে তথায় পাতা রহিয়াছে। যুবকের প্রার্থনায় তিনি ঐ আসনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন এই বাড়ী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এবং ঐ যুবক যিনি তাঁহাকে জলপান করাইবার জন্য উপরে লইয়া গিয়াছেন তিনি গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযোগ-জীবন। এইরূপ যোগাযোগ অবলোকন করিয়া তাঁহার আশ্চর্যের আর সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কোন প্রকারেই তিনি শ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট যাইবেন না। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি আপন বাসস্থান হইতে শ্রীগোস্বামী প্রভুর বাড়ীর উল্টা দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া যে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা তিনি কোন রকমেই ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না। সবই

যেন তাঁহার নিকট প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ইতোমধ্যে শ্রীপ্রভুপাদ মন্থর গতিতে সহাস্য বদনে ঐ কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে সতীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি ঠিক সময়ই আসিয়াছ। আমি তোমার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" এই কথা বলিয়াই তিনি তাহাকে পার্শ্বের এক ঘরে লইয়া যান। তথায় পূর্ব হইতেই দুইখানা আসন পাতা ছিল। তিনি সস্মিত আননে বলিলেন, "এখানে তুমি বসো, তোমার দীক্ষা হইবে।" শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সতীশবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন; কিন্তু তিনি ইহার কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, "আমি তো এখানে আসিতে চাহি নাই; কি করিয়া এখানে আসিলাম?" শ্রীগোসাঁইজী উত্তর দিলেন, "যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিবেই। তাহা কেহ বাধা দিতে পারে না। আজই তোমার দীক্ষা গ্রহণের দিন নির্ধারিত হইয়া আছে।" সতীশবাবু শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের এই কথার উপর আর কোন প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি অবনত-মস্তকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং প্রভু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাক যথা-বিধি দীক্ষা প্রদান করিলেন। দীক্ষা ক্রিয়া সমাপন হইবার সাথে সাথে তাঁহার ভিতর নানাবিধ বিচিত্র অনুভূতি সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই সময় তাঁহার নিজের এবং গুরুদেবের যথার্থ স্বরূপ দর্শন হয়। তিনি

অনুভব করিলেন এই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ আজ নূতন নহে, ইহা শাশ্বত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া গেল।

দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি শিথিল গতিতে চিন্তা করিতে করিতে আপন বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল প্রকৃতপক্ষে সত্য বস্তু অর্থাৎ ভগবৎসত্বা বলিয়া কোন বস্তু আছে কিনা? যদ্যপি এ বিষয়ে তাঁহার সেইদিন অনেক অনুভূতিই হইল সত্য, তথাপি সংশয় একেবারে নির্মূল হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই সকল উপলব্ধি কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে হইতেছে না তো? এই প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের মধ্যে তাহার সারাদিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি স্নান করিতে স্নানাগারে গেলেন তখন সেখানে তাঁহার বোধ হইল তাঁহার সমস্ত সত্তা অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি সব নিংড়াইয়া একটি ভাবময় ধ্বনি উঠিল "আমি আছি! আমি আছি!! আমি আছি!!!" ইহা কিন্তু ভিতরের কিংবা বাহিরের কোন শব্দ নহে, তথাপি ইহা শব্দই, শুদ্ধ বোধাত্মক শব্দ। ইহা শ্রবণ করিবার পর তাঁহার শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় সমূলে বিনষ্ট হইল এবং জীবনে পুনরায় কখন আর সন্দেহ মনে উদয় হয় নাই। ভক্তপ্রবর গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস বিরচিত শ্রীরাম-চরিতমানসে একটি সুন্দর দোহায় বলা হইয়াছে বর্ষাকালে পৃথিবী নানা রকমের পোকামাকড়ের দ্বারা ভরিয়া যায়, সেই সকল কীটপতঙ্গ শরদ্-ঋতুর আগমনে তেমনি নষ্ট হইয়া যায় যেমন সদ্গুরুর প্রাপ্তিতে সন্দেহ এবং ভ্রম অর্থাৎ অজ্ঞান নষ্ট হয়।

দোহা :—ভূমি জীব সংকুল রহে গএ সরদ রিতু পাই।
সদগুরু মিলেঁ জাঁহি জিমি সংশয় ভ্রম সমুদাই॥

মহাত্মা সতীশবাবুর জীবনে তাঁহার গুরুদেব শ্রীবিজয়কৃষ্ণের কৃপা দীক্ষার দিন হইতে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত সমান ভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রথম প্রথম তিনি গোস্বামী প্রভুর অন্যান্য শিষ্যদের মতন খুব জপ-ধ্যান করিতেন কিন্তু তাঁহার গুরুর ব্যবহারে মনে হইত ইহা যেন তাঁর মনঃপুত নহে। অন্য শিষ্যদের প্রতি তাঁহার নির্দেশ ছিল অধিকারানুসারে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জপের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ধ্যানের সময় অধিক করিবার জন্য কিন্তু সতীশবাবুকে তিনি জপ-সংখ্যা কমাইতে বলিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন গুরুদেব আমাকে অযোগ্য মনে করিয়াই বোধ হয় এইরূপ আদেশ করিতেছেন। তবে কি আমার এইজন্মেই উদ্ধার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই! শিষ্যের এই প্রকার ধারণা অবগত হইয়া গোসাঁইজী একদিন তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন, "এখন তোমার আর জপ ধ্যান কিছু করিতে হইবে না। তোমার যাহা করণীয় তাহা তোমার হইয়া এখন হইতে আমিই করিব। তোমার সাধনার আর প্রয়োজন নাই। তোমার সেই অবস্থা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার কিছু কার্য এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা তোমাকেই করিতে হইবে, কারণ উহা আমি তোমার হইয়া করিতে পারিব না। তোমাকে লোক-শিক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে, যেহেতু উহা তোমারই প্রারব্ধ-কর্ম। ঐ কর্মের জন্যই তোমাকে জন্ম লইতে হইয়াছে, সাধনার জন্য নহে।"

সতীশবাবুর গর্ভধারিণী প্রায়ই সতীশবাবুকে বিবাহের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি আর কয় দিন ? আমি চোখ মুদিলে তোর কি গতি হইবে, সেই ভেবেই আমি তোকে বিয়ে করিতে বলি। আমি তো দেখি, কোথায় তোর কাপড়, কোথায় জামা, কোথায় জুতো,—কিছুরই দেখি তোর ঠিক নাই। বিয়ে করলে এই সব বৌই ঠিকঠাক করে রাখবে। তোকে কোন চিন্তা করতে হবে না।" কিন্তু সতীশবাবু এইসব যুক্তিতে ভুলিবার ছেলে নয়। তিনি তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পে হিমাচলের ন্যায় ছিলেন অচল, অটল, স্থির।

দীক্ষার পর সতীশবাবু একদিন গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক গুরুভ্রাতা শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বসিতেই, সদ্‌গুরু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিলেন। শিষ্যটির মাতা পারিবারিক কোন কারণে তাঁহার পুত্রের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন, "তুমি কি ভেবেছ ? আমার নিকট দীক্ষা লইয়াছ বলিয়াই কি তোমার মুক্তির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে ? তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া দিব ? যে আপন পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের বিরাগভাজন হয়, তাহার উর্দ্ধগতির সব দরজা বন্ধ। আমার বাবারও সাধ্য নাই তাহাকে উদ্ধার করে। আগে মাতার প্রসন্নতা লাভ কর, তারপর আমার কাছে এসো।"

সতীশবাবু চুপ করে বসে এই সব কথা শুনিলেন এবং গুরুভাইটি

চলিয়া গেলে গুরুর চরণে অতিশয় কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, “প্রভো! আমি মায়ের প্রসন্নতা লাভ না করিলে কি আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না? আমি আপনাকে ছাড়া ত্রিভুবনে আর কিছুই জানি না। আমি জানি আপনিই আমার একমাত্র উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা।” গোস্বামী মহাশয় মিষ্টি হেসে বলিলেন, “না, সে আমি পারি না। কোন গুরুরই সাধ্য নাই সেই শিষ্যকে উদ্ধার করে। কেন, তোমার মা কি তোমার উপর অপ্রসন্ন?” সতীশবাবু বলিলেন, “হাঁ, আমার মা দিনরাত কান্নাকাটি করেন আমি বিয়ে করছি না ব'লে। তিনি আমার বিবাহে অসম্মতির জন্য বড় অপ্রসন্ন।” গোসাঁইজী হেসে পুনরায় বলিলেন, “বেশ তো, তাহা হইলে তুমি বিয়ে কর না। মা, তা হ'লে প্রসন্ন হবেন। আর বিয়ে করলেও তোমার কোন ভয় নেই। তোমার বৌ বাঁচবে না, তোমাকে সংসার করিতে হইবে না বেশী দিন।” তিনি শ্রীগোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, “এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। এতদিন নিজের বুদ্ধিতে চলেছি। এখন আপনি যাহা নির্দেশ দিবেন তাহাই আমি নির্বিচারে পালন করিব। বিবাহ করিতে বলিলে, বিবাহ করিব। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই আমি করিব। আমার আপন কোন স্বতন্ত্র মত এখন আর নাই।”

শ্রীগোসাঁইজীর নির্দেশ মত মায়ের কাছে গিয়ে শ্রীসতীশচন্দ্র জানালেন যে মা যদি চান তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিতে সম্মত আছেন। জননীও ছিলেন তেমনি মহীয়সী। পুত্রের এই কথা

শুনে তিনি বলিলেন, "আমার জন্য তোকে বিয়ে করিতে হইবে না। আমি ভাবি শুধু তোর জন্য। আমাকে খুশি করিবার জন্য তোকে বিয়ে করিতে হইবে না, আমি তোর উপর সদা প্রসন্নই আছি।" সতীশবাবু এইভাবে তাঁহার বিবাহ-সংকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাথে সাথে অর্জনও করিয়াছিলেন মায়ের প্রসন্নতা। শ্রীগুরু অনুকূল হইলে সবদিক দিয়েই সুরাহা হইয়া যায়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের মুখনিঃসৃত নির্দেশের পরই তিনি কলিকাতা মহানগরীতে ডন সোসাইটি (Dawn Society) স্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানের একখানা মুখপত্রও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সাথে সাথে সোসাইটির বৃহৎ অধিবেশনেরও মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই কার্য সঞ্চালন করিবার সময় তিনি সুযোগ মত একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সব কাজ আর কত দিন করিতে হইবে?" গোসাঁইজী উত্তরে বলিলেন, "যত দিন কাজ করিতে আমি নিষেধ না করি তত দিন ইহা করিয়া যাও। আমার কথায় ইহা শুরু করিয়াছ যখন আমি বলিব তখন ইহা বন্ধ করিও।" ডন সোসাইটি (Dawn Society) এবং ডন পত্রিকা (Dawn Magazine) এইরূপে ১৮৯৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমানভাবে চলিল। সতীশবাবুই এই সময় কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের (National College) স্থাপনা করিয়া ইহার প্রধান ও প্রথম আচার্যেরপদ অলঙ্কৃত করেন। এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের জনজাগরণের নিমিত্ত যে সকল কার্য সতীশবাবু সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রসংশার যোগ্য এবং অসাধারণ বলিয়া পরিগণিত

হইতে পারে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশানুসারে এই কাজের পরিসমাপ্তি হয়। এই সময়ের মধ্যে কিছুকাল তিনি গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে গৃহশিক্ষকের কার্য করিয়া আপন জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। হাইকোর্টের প্র্যাকটিস তিনি গুরুর নির্দেশ মত ইহার পূর্বেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবান্ কি ভাবে যে কাহাকে তাঁহার নিকট টানিয়া নেন তাহা বোঝা মানবশক্তির অগম্য এবং অসাধ্য।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম দিকে একদিন জগতের জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার কোমল মন দ্রবীভূত হয়। আর্তজনের দুঃখ কি করিয়া দূর করা যায় ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। দুঃখের চিরতরে আত্যন্তিক নিবৃত্তিই যে মুক্তি তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু ইহা মানবের পক্ষে লাভ করা কি সম্ভব? এ বিষয়ে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই প্রকার মানসিক অত্যধিক ব্যাকু-লতার মধ্যে তিনি অভুক্তাবস্থায় চিন্তা করিতে করিতে গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। অকস্মাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার ঘর উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তিনি দেখিতে পাইলেন একজন মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দেহ জ্যোতির্ময় এবং মুখখানি অপার করুণায় সমুদ্ভাসিত। তিনি সতীশবাবুকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি এত চিন্তিত কেন? তুমি কেন এত দুঃখ করিতেছ?" তিনি উত্তরে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! সংসারের এত দুঃখ, কষ্ট ও অভাব দেখিয়া আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আমি চিন্তা করিতেছি

এই সকল দুর্দশা হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় আছে কিনা?

মহাপুরুষ সতীশবাবুকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া মৃদু-স্বরে বলিলেন, "তোমার দৈন্য দেখিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। আমি তোমাকে যাহা দিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর. তোমার দুঃখ, কষ্ট ও অভাব সব চিরদিনের মত দূর হইয়া যাইবে।" সতীশবাবুর মনে হইল মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে কোন মন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। তিনি মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া এবং পরদুঃখে তাঁহাকে করুণায় বিগলিত অবলোকনকরতঃ ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষকে কি উত্তর দিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। মহাপুরুষ সতীশবাবুকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি কিছু চিন্তা করিও না। আমি যাহা প্রদান করিতেছি তাহা নিঃসংশয়ে তুমি গ্রহণ কর—উহার প্রভাবে তোমার সকল দুঃখের চির অবসান হইয়া যাইবে। দুঃখ একবার বিনাশ হইলে, উহা পুনরায় আর আবির্ভূত হইবে না।" ক্ষণিকের জন্য তাঁহার মনে হইল মহাপুরুষের নির্দেশানুসারে মন্ত্রটি গ্রহণ করিলে ক্ষতি তো কিছুই নাই, বরং লাভই হইবে। দুঃখ একেবারে চিরদিনের মত দূর হইয়া যাইবে। এই প্রকার ভাব হৃদয়ে উদিত হইতেই সহসা তাঁহার মনে কেমন যেন একটা আঘাত লাগিল। তাঁহার অন্তরাত্মা জানাইয়া দিল তাঁহার মনে অন্যথাচার ভাব আসিয়াছে। তিনি বিচার করিতে লাগিলেন, আমি তো সদ্‌গুরুর আশ্রিত! আমার দুঃখ নিবৃত্তি আমার গুরুদ্বারাই হইবে। ইহার জন্য অন্যের প্রতি কেন আমার মন আকর্ষিত হইতেছে?

ইহাদ্বারা আমার চিত্তের দুর্বলতা ও অস্থিরতাই সূচিত হইতেছে। তিনি অতিশয় বিনীত ভাবে সেই মহাপুরুষকে নিবেদন করিলেন, "মহাত্মন্! আপনি আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য যাহা দিতে চাহিতেছেন তাহা আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ উহা যদি আমার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমার গুরুদেব মহাত্মা প্রভু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ই উহা আমাকে প্রদান করিবেন। আপনার নিকট হইতে কেন আমি উহা লইব? আমার মনে ক্ষণেকের জন্যও অপনার নিকট হইতে কিছু গ্রহণের ভাব আসা উচিত ছিল না। ইহা আমার মনের ব্যভিচার ও চঞ্চলতার পরিচয় দিতেছে। আমার জীবনে দুঃখ থাকিবার হইলে থাকিবে, আমি আপনার দ্বারা উহা দূর করিতে চাহি না। যাহা আমার জীবনে আবশ্যক এবং তাহার নিমিত্ত যাহা কিছু করিবার তাহা আমার গুরুদেবই করিবেন। গুরু ছাড়া অপর কাহারও নিকট আমি কিছুই প্রার্থনা করি না। কেহ কিছু দয়া করিয়া দিলেও তাহা আমি লইব না।" আমার মুখে এই কথা শুনিয়া মহাত্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং আশীর্বাদ দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার গুরুভক্তি দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট হইতে যে কিছু লইতে স্বীকার হও নাই ইহাতে আমি আনন্দিতই হইয়াছি। তোমার যাহা আবশ্যক তাহা তুমি তোমার গুরুর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্বান্তঃকরণে হৃষ্টচিত্তে আশীস্ দিতেছি তুমি ইহা হইতে বড় জিনিস পাইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এই অচিন্তনীয় ঘটনার পর সতীশবাবুর আর নিদ্রা আসিল না।

তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগকরতঃ যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অতি ব্যাকুলতার সহিত শ্রীগুরুদেবের সকাশে গমন করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় শ্রীগোস্বামী মহাশয় কলিকাতায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুর চরণে প্রণামপূর্বক তিনি একান্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ব-রাত্রির সকল বৃত্তান্ত আনু-পূর্বিক নিবেদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ মহাপুরুষ কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, "উনি একজন সিদ্ধ মহাত্মা। এই সব সিদ্ধ মহাত্মাগণ মহানিশায় নানা দিকে বিচরণ করিয়া বেড়ান এবং যোগ্য আধারে বস্তু দান করিয়া থাকেন। তিনি কিছু দিতে চাহিয়াছিলেন, তুমি গ্রহণ করিলে না কেন? গ্রহণ করিলে তোমার দুঃখ চিরদিনের মত নিবৃত্ত হইয়া যাইত। ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" সতীশবাবু উত্তর দিলেন, "আমার মনে হইতে ছিল উহা গ্রহণ করিলে আমার হৃদয় ব্যভিচার দোষে দূষিত হইত। যদি কিছু গ্রহণ করিতে হয় আপনার কাছ হইতেই উহা গ্রহণ করিব। তাঁহার নিকট হইতে লইব কেন? আমার যদি কিছু আবশ্যক হয় এবং আপনি যদি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, আপনিই দিবেন। আমি উহা চাহিব কেন? কিন্তু এই মহাপুরুষের একটি কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি জানি আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মোক্ষ। মুক্তি হইতে আর কি বড় জিনিস আছে, যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য মহাপুরুষ আমাকে আশীর্বাদ করিলেন।" গোস্বামী প্রভু সতীশবাবুর প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া বলিলেন, "মুক্তি অধ্যাত্ম-সাধনার শেষ নহে। ইহা হইতেও বড় জিনিস আছে।

কত সিদ্ধ যোগী ও ভক্ত মহাপুরুষ মুক্তিলাভ করিয়াও কাঁদিতেছেন। পরম বস্তুর অভাবে শান্তি পাইতেছেন না। মুক্ত হইলে কি হয়? জনম মরণ হইতে নিষ্কৃতি পায় সত্য, কিন্তু যথার্থ মানবজন্ম সফল হয় না।" সতীশবাবু পুনরায় কহিলেন, "শুনিয়াছি, মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, ইহাই মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। ইহা পাইলে আর কিছু পাওয়া অবশিষ্ট থাকে না। মুক্তি হইতেও কি বড় কিছু আছে?" এই কথা সতীশবাবুর মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ গো, মুক্তি হইতেও বড় জিনিস আছে," গোসাঁইজীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, ইহা হইতে বড় জিনিস জগতে আর কি থাকিতে পারে? তাই পুনরায় তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য বলিলেন, "গুরুদেব! মুক্তি হইতেও কোন বড় জিনিস থাকিতে পারে, ইহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়া করিয়া তাহা হইলে আমাকে বলুন সেই বস্তুটি কি?" প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সতীশবাবুকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে অতি মৃদুস্বরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মুক্তি হইতেও অতি বড় জিনিস আছে। জানো ঐ বস্তুটি কি? উহার নাম ভগবৎপ্রেম, যাহার জন্য মুক্ত পুরুষেরাও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পরও হাহাকার করিতেছেন। ইহা জগতে অতি দুর্লভ বস্তু, সকলে পায় না।"

কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার পূর্বে গুরুদেব শিষ্যকে একান্তে ডাকিয়া কয়েকটি আদেশ করিলেন এবং সাধ্যানুসারে উহা আজীবন পালন করিতে বলিলেন। তিনি সতীশবাবুকে পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর রাখিতে এবং অর্থোপার্জনের সকল প্রকার

প্রযত্ন করিতে বারণ করিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বেশ ভাল আয়ের ওকালতি ব্যবসা তিনি পূর্বেই গুরুর নির্দেশে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অর্থের জন্য কোন প্রকার চাকুরীও নিষেধ হইল। পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াও অর্থ সংগ্রহের পথ বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। সাথে সাথে কাহারও নিকট হইতে অর্থ যাচনাও নিষেধ হইয়া গেল। এমন কি কোন রকম অভাবের কথাও যেন কেহ জানিতে না পারে। এত সকল বাধা সত্ত্বেও তাঁহাকে ভাল বাড়ীতে সেবক ও অনুগত লোকদের লইয়া সাবলীল-ভাবে আরামে জীবন যাপন করিবার নির্দেশ দিলেন। ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং কঠোর আদেশ, কিন্তু গুরুনিষ্ঠ মহাত্মা শ্রীসতীশ-চন্দ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গুরুদেবের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের উপর কতখানি নির্ভরতা ও গুরুর প্রতি কত শ্রদ্ধা থাকিলে তবে এই প্রকার আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানব জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। সতীশ-বাবুর জীবন ব্যতীত অপর কাহারও জীবনে এ জাতীয় ঈশ্বর-নির্ভরতা ও গুরুশ্রদ্ধা বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমান বস্তুতন্ত্রযুগে এই প্রকার রিক্ত হস্তে জীবন যাপন করিতে যাওয়াকে লোকে কেবল উপহাসই করিবে না বরং ইহাকে বাতুলতা বলিয়াই গণ্য করিবে।

সর্বপ্রকার অর্থাগমের উপায় বন্ধ হওয়ার পরও দেখা যাইত প্রতিমাসে গুরুকৃপায় তাঁহার প্রচুর অর্থ আসিত এবং খরচের পর যাহা টাকা বাঁচিত তাহা তিনি কোন সৎকার্যে ব্যয় করিতেন।

অধর্মোপার্জিত ধন কাহারও নিকট হইতে আসিলে তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন না। অর্থের প্রয়োজন না থাকিলে যদি কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিছু দান বরিত তাহাও তিনি লইতেন না। একবার রাজা শ্রীগৌরীশঙ্কর গোয়েনকা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন তিনি একটা ছেঁড়া খদ্দরের জামা পরিয়া বসিয়া আছেন। মহাত্মা সতীশবাবুকে একটা শতচ্ছিন্ন জামা পরিধান করিতে দেখিয়া তাহার বড়ই দুঃখ হইল। পরের দিন শেঠ শ্রীগোয়েনকা তাহার কোন কর্মচারীর হাতে একটি নূতন পিরান তাঁহার নিকট পাঠাইয়া প্রার্থনা জানাইলেন তিনি যেন দয়া করিয়া উহা ব্যবহার করেন। সতীশবাবু উহা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "উপস্থিত এই জামাতেই আমার কাজ চলিতেছে, নূতন জামার আবশ্যক নাই। এখন ইহা গ্রহণ করিলে গুরুদেব অসন্তুষ্ট হইবেন। আপনি আমার কাছে ধর্মালোচনা ও সৎসঙ্গ করিতে আসেন, না আমার পরিধানে কেমন বস্ত্র আছে, গায়ে কেমন জামা আছে, তাই দেখিতে আসেন। যদি এই সব দিকে আপনার দৃষ্টি যায় তাহা হইলে কষ্ট করিয়া এত দূর আপনার আসার কোন সার্থকতা দেখি না।" একবারের একটি সুন্দর ঘটনা। কাশীতে যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন সেই বাড়ীর মালিক প্রতিমাসের দুই কি তিন তারিখে ভাড়া নিতে আসিত। একবার দুই মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়া যায়। যাহার মারফত বা মধ্যস্থতায় ভাড়ার টাকা দেওয়া হইত তিনি টাকার জন্য তাগাদা করাতে সতীশবাবু বলিলেন, "টাকা এখনও আসে নাই, কি করিয়া বাড়ী ভাড়ার টাকা দিব? টাকা আসিলেই আপনাকে দিয়ে দিব।" সেই ভদ্রলোক

সতীশবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাড়ী ভাড়ার টাকা প্রতিমাসের দুই তিন তারিখে দেওয়া হয়। দুই মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। টাকা যথা সময়ে না পাইলে বাড়ীর মালিক বড় রোখা লোক অপমান করিতে পারে।" উত্তরে পুনরায় তিনি বলিলেন, "গোসাঁই টাকার জন্য যদি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে লোকের দ্বারা অপমান করাতে চান, অপমানিত হইব। টাকা আমার কাছে নাই, এখনই আপনাকে টাকা কোথা হইতে দিব। ধার তো করিতে পারি না। কাহাকেও অভাবের কথা জানাইতেও পারি না। গুরু-দেবের নিষেধ আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গোসাঁই টাকার জন্য আমাকে কখনও অপমানিত হইতে দিবেন না।" এই ঘটনার কয়েকদিন পর টাকা আসিল। যেদিন টাকা আসিল সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাড়ীর মালিক আসিয়া বলিল, "আমি মাসখানেকের জন্য বিশেষ কাজে কাশীর বাহিরে গিয়াছিলাম। সেইজন্য যথা সময়ে বাড়ী-ভাড়ার টাকা নিতে আসিতে পারি নাই। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। একসঙ্গে দুই মাসের ভাড়া দিতে যদি আপনার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে এই মাসেরটা দিন বাকী টাকা ধীরে ধীরে আপনি শোধ করিয়া দিবেন।" সতীশবাবু এক সাথেই দুই মাসের বাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। যাহার মারফতে টাকা দেওয়া হইত তাহাকে তিনি বলিলেন, "শ্রীগোস্বামী প্রভুর উপর আপনার বিশ্বাস নাই কেন? তিনি কখনও আমাকে কাহারও কাছে অপদস্থ করিবেন না এবং কাহারও দ্বারা আমাকে অপমানিত হইতে দিবেন না। এই বিশ্বাস আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করুন।"

এই ভাবে নানা স্থান হইতে প্রতিমাসে তাঁহার নিকট অর্থাগম হইত। তাঁহার মাসিক ব্যয় নির্বাহের পর যে টাকা উদ্বর্ত হইত সেই টাকা তিনি নিজের কাছে না রাখিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগের নিমিত্ত পুরীধামে পাঠাইয়া দিতেন। ভোগের পর ঐ প্রসাদদ্বারা তথায় দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইত। কখন কখন তিনি ঐ উদ্বর্ত টাকা বিভিন্ন রকমের ধর্মকার্যেও ব্যয় করিতেন। সার কথা হইল তিনি কোন সময়েই নিজের কাছে ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করিতেন না। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তবৃন্দ জগন্নাথের ভোগ ও ধর্মকার্য বন্ধ করেন নাই। আশ্চর্যের বিষয়! তাঁহার শরীর রক্ষার পরও গুরুকৃপায় এবং শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার অগাধ ও অবিচল ভক্তি নিষ্ঠার প্রভাবে সেই সব কার্য পূর্ববৎ এখনও চলিতেছে।

সতীশবাবু বলিতেন সাধক-জীবনের সমাপ্তিতে, সাধকের মুক্তি প্রাপ্তির পর অনুভব হয় আমি শ্রীভগবানের। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি না হয় ততক্ষণ এই প্রকার অনুভব যথার্থরূপে সাধকের জীবনে আসে না। পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণকে তিনি শ্রীমূর্তিদর্শন বলিতেন। পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হইলে "আমি তাঁহার উপর নির্ভরশীল" এই ভাবও থাকে না। "প্রভু আমাকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন" কেবল ইহাই সর্বদা হৃদয়ে জাগরিত থাকে। যাহা কিছু এই শরীরের দ্বারা হইতেছে সবই তাঁহার কাজ। তিনি এই দেহটাকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার কাজ করাইয়া নিতেছেন মাত্র।"

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে নবযোগীন্দ্র সংবাদে কবি বলিতে-ছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাঽত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ২।৩৬

যাঁহারা ভাগবতধর্মের পালন করেন তাঁহাদের জন্য এমন কোন নিয়ম নাই যে তাঁহারা কোন এক প্রকার বিশেষ কর্মই করিবেন। তাঁহারা শরীরদ্বারা, বাণীদ্বারা, মনদ্বারা, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা, বুদ্ধি-দ্বারা, অহংকারদ্বারা, একজন্মের কিংবা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ যে যে কর্ম তাঁহারা করেন, সেই সব কর্ম পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীনারা-য়ণের জন্যই করা হইতেছে—এই ভাব লইয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। ইহা হইতে সরল ভাগবতধর্ম আর কিছু নাই। ইহাই ছিল আমাদের আলোচ্য মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্রের জীবনের আদর্শ।

প্রকৃত সাধকের জীবনে প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবান্ অথবা গুরুর প্রসন্নতা লাভ করা। নিজের চেষ্টায় বা সাধনাদ্বারা কামনা সিদ্ধি না করিয়া কর্তৃত্বাভিমানের নাশ করাই উপাসনা বা আরাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কর্তৃত্বাভিমান যত ক্ষীণ হইতে থাকিবে ভগবৎ-কর্তৃত্ব তত অনুভব হইবে এবং সাধনার লক্ষ্য বস্তু নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকিবে। আপন প্রযত্নদ্বারা অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে অহংকার বৃদ্ধি এবং চেষ্টা বিফল হইলে বিষাদ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। জীবের যত দুঃখ ও দুর্দশা তাহার মূলে রহিয়াছে ভগবদ্বিমুখতা। মায়াচক্রে পতিত জীবের প্রধান রোগ হইল ভগবদ্বিস্মরণ। ইহা দূর না করিয়া কেবল জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ ও বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা আনন্দানুভব ও হৃদয়কে সরস করার যত্ন ভস্মে ঘৃতাহুতির সমান। এই সবের দ্বারা ভবরোগের বীজ নষ্ট হয় না। যদি এই ভগবদ্বিমুখতা বা ভগবদ্বিস্মরণ নিবৃত্ত হইয়া যায়

তাহা হইলে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে লুক্কায়িত আছে সে সকল চিরতরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। সাধন ভজন করিয়া আনন্দ লাভ করিব এই ইচ্ছাও যখন হৃদয় হইতে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তখন ভগবৎ-কৃপা বা গুরু-কৃপা লাভ হয়। ভগবৎ-প্রীতি বা গুরুর প্রসন্নতার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য। সাধককে অনুক্ষণ মনে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে যথার্থ ধর্মজীবনের আদর্শ আনন্দ ও অনুভূতি লাভ নহে বরং শ্রীগুরুর চরণে সম্যক্ প্রকারে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। যথার্থ আত্মোন্নতি কতগুলি অনুভূতির দ্বারা হয় না, উহাতে কেবল অহঙ্কারই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু গুরুচরণে আত্মসমর্পণের পর যে আধ্যাত্মিক অনুভব সকল প্রকাশিত হয় তাহাদ্বারা অহঙ্কার সমূলে নাশ হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে কখন উহা অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মুক্তপুরুষের জীবনে অলৌকিক ও যৌগিক শক্তির বিকাশ হইলে কোন ভয়ের কারণ নাই কিন্তু মুক্তিলাভের পূর্বে যদি ঐ সকল শক্তি আসে তাহাতে বিপদের বা পতনের আশঙ্কার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় থাকে। ইহাতে আত্মভিমান (Self-Vanity) স্ফীত হয় এবং ধর্মজীবনের প্রগতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন ঠিকভাবে করিলে সেই আশ্রিত জীবকে তিনি আপন করিয়া নেন। শক্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিভূতি প্রভৃতি বাহিরের বস্তু। এই সবে আসক্তি থাকিলে পরম বস্তু যে ভগবৎপ্রেম তাহা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতে হয়। আত্মশক্তির প্রভাবে, ভগবানের কোলে বসিবারও

ক্ষমতা যদি আসে তাহা হইলেও 'ভগবানের আশ্রিত যে আমি' ইহার যথার্থ অনুভব বা বোধ হয় না। অতএব প্রকৃত সাধন-পথের যাত্রীর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমি শ্রীভগবানের চরণে সর্বতো ভাবে সমর্পিত এবং সব সময়ের জন্য অভিমানশূন্য হইয়া যে আছি ইহার ঠিকঠিক অনুভব হওয়া। এই স্থিতি যদি গুরুর অনু-কম্পায় জীবনে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। তাঁহার করুণায় শত শত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ক্রমশঃ নিত্য নূতন-নূতনরূপে স্ফুরণ হইতে থাকিবে—কিন্তু প্রকৃত ভগবৎ-ভক্ত বা ভগবানের সত্য আশ্রিত-জন সে দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। সাধনার প্রারম্ভে জীবনের প্রধান প্রাপ্তব্য বস্তু যে ভগবৎ-প্রেম ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তবে উহাতে অগ্রসর হইতে হয়। এই-জন্য মনে রাখিতে হইবে জপ, ধ্যান, পূজা পাঠাদি অনুষ্ঠানই সাধনার চরম উদ্দেশ্য নহে। ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির নিমিত্ত গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই সাধকের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস প্রণীত শ্রীরামচরিতমানসের উত্তরকাণ্ডে কাকভুশুণ্ডি গরুড়কে বলিতে-ছেন—

জপ তপ মখ সম দম ব্রত দানা। বিরতি বিবেক যোগ বিগ্যানা॥
সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেমা। তেহি বিনু কোউ ন পাবই ছেমা॥

জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, শম অর্থাৎ মনঃনিগ্রহ, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রত, দান, বৈরাগ্য, বিবেক, যোগ, বিজ্ঞানাদি সকল প্রকার সাধনার ফল হইল শ্রীরঘুনাথের চরণে প্রেম বা অনুরাগ। শ্রীভগবানের প্রতি

ভক্তি বিনা কেহ কল্যাণের ভাগী হইতে পারে না। এই সুন্দর ভাবটি মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্রের জীবনালেখ্যে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছিল। ইহা যে কত উচ্চাবস্থা তাহা আমরা মনে ধারণাও করিতে অসমর্থ। ভগবদাশ্রয়ের ন্যায় গুরুশরণাগতি সম্বন্ধেও সতীশবাবুর সিদ্ধান্ত ছিল শিষ্যের তত দিন পর্য্যন্ত সাধনা করা উচিত যত দিন পর্যন্ত সম্যক্ প্রকারে গুরুর অনুগত না হওয়া যায়। একবার গুরুর আশ্রিত হইতে পারিলে গুরুই সব-কিছু শিষ্যের জন্য করেন। যিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন তাঁহার আর কিছু করার অবশিষ্ট থাকে না। গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার সকল কার্য সময় মত শনৈঃ শনৈঃ স্বয়ংই হইয়া যায়। শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণের পর হইতে সতীশবাবু গুরুর সম্মতি না পাইলে কোন কাজ করিতেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অনেক সন্ধানের পর দেখা গেল তিনি এক অন্ধকার ঘরে গোসাঁইজীর ছবির সন্মুখে হাতে মোমবাতি ও দিয়াশলাই লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "অন্ধকার ঘরে হাতে মোমবাতি ও দিয়াশলাই লইয়া আপনি দাঁড়াইয়া কেন ? বাতি জ্বালান।" তিনি উত্তর দিলেন, "গোসাঁই বাতি জ্বালাইবার জন্য আদেশ দিতেছেন না। তাই অনেক ক্ষণ এখানে এইভাবে দাঁড়াইয়া আছি।" প্রায় দশ মিনিট পর তিনি মোমবাতি জ্বালাইলেন। এইরূপে তিনি জীবনের প্রত্যেকটি কার্য গুরুর নির্দেশ মত বা তাঁহার সম্মতি লইয়া সম্পাদন করিতেন। এইপ্রকার আদর্শ গুরুনিষ্ঠ ব্যক্তি বর্তমান যুগে খোঁজ করিয়া আর

দ্বিতীয়টি পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহা শোনা কথা নহে। প্রবন্ধ লেখক এই ঘটনাটি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সতীশবাবু সাধনার তিনটি স্তর বলিতেন। প্রথম স্তর হইল শিশুভাবে জীবসেবা। সংসারের প্রত্যেকটি জীব শ্রীভগবানের সন্তান বা শিশু। এই ভাবটি মনে রাখিয়া জীব মাত্রের সেবা করা। এই সেবায় কোন প্রকার দেশ, জাতি. বর্ণ বা সম্প্রদায়ের বিচার করিতে নাই। দ্বিতীয় স্তর শাস্ত্রানুবর্তন এবং তৃতীয় স্তর হইল ভগবদারাধনা। ইহা তখনই হওয়া সম্ভব যখন শ্রীভগবানের সহিত আরাধকের সাক্ষাৎরূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এই তিনটি স্তর পার করিবার পর সাধনাবস্থা সমাপ্ত হয়, তখন প্রকৃত ভগবৎভজন আরম্ভ হইয়া থাকে। মহাত্মা শ্রীসতীশচন্দ্রের জীবনে উত্তরোত্তর এই তিনটি স্তর নিম্ন লিখিতরূপে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

প্রস্তাবনা কাল—১৮৬৫ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। এই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা, অধ্যয়ন, ওকালতী ব্যবসা, দীক্ষা এবং উপার্জনের সমাপ্তি হইয়াছিল এবং তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার বাসনাশূন্য জীবন ব্যতীত করেন। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ভূমিকামাত্র বা প্রস্তুতি বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্তর—১৮৯৭ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। ইহা তাঁহার জীবসেবার সময় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছাড়ার পর তিনি একান্তবাস ও যোগ-সাধনায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীগোস্বামী মহাশয় বলিতেন "এই

সব সাধন সতীশের প্রয়োজন ছিল না। তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল জগতে লোকশিক্ষার কার্য সঞ্চালন করা এবং নিঃস্বার্থরূপে জনসেবা।" আর্থিক আয়ের জন্য কোন কাজ করা তাঁহার গুরুর নিষেধ ছিল। তাঁহার নির্দেশ মত সতীশবাবু এই ষোল বৎসর শিক্ষাপ্রচারে জন্য নানাবিধ জনহিতকর কার্য করিয়াছেন। ডন সোসাইটি, ভাগবত চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় শিক্ষার বিস্তার মহাত্মা সতীশচন্দ্রের জীবনে কম অবদান নহে। এই নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য বাঙ্গালী সমাজ তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবেন।

দ্বিতীয় স্তর—১৯১৩ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কাশীধামে বাসকরতঃ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিবিধ দর্শন শাস্ত্র অনুশীলন করেন। তাঁহার বিরাট পুস্তকালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, যোগ, আগম, নিগম প্রভৃতি বহু পুস্তক সযত্নে রক্ষিত ছিল। বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ সর্ব-শাস্ত্রের অগাধ পণ্ডিত ও অনুভবী সাধক মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপী-নাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সতীশবাবুর এই সময় পরিচয় হয়। তিনি তাঁহার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সরস্বতী ভবন লাইব্রেরী হইতে নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারের ধর্মগ্রন্থ সকল যোগান দিয়া তাহার শাস্ত্রানুবর্তনে সহায়তা করিতেন। মহাত্মা সতীশচন্দ্রের সহিত যোগনিষ্ঠ পরম সাধক শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের মিলন যেন মণিকাঞ্চন যোগ। কবিরাজ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিতেন সতীশবাবুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত লাভান্বিত

হইয়াছিলেন। এই সময়ই তাঁহার গুরু ভ্রাতা ব্রহ্মচারী শ্রীকুলদানন্দের আধ্যাত্মিক ডায়্যারী বা দিনপঞ্জী "সদ্‌গুরু-সঙ্গ" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সতীশবাবু এই অপূর্ব গ্রন্থখানির সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহু দুর্লভ (Rare) পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। সেই সকল গ্রন্থ তিনি জন সাধারণের পাঠের জন্য কাশীর কোন বিশিষ্ট ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াগিয়াছেন।

তৃতীয় স্তর—১৯৩০ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ। এইটি ছিল তাঁহার ভগবদারাধনারকাল ইহা ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর হইতে প্রারম্ভ হয়। তিনি ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে সজ্ঞানে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার শরীর ত্যাগের সাথে সাথে ভগবদারাধনারও পূর্ণতা হয়। তাঁহার ভগবদারাধনার বিষয় কেহ কিছু জানিতে পারিত না। ইহা তিনি বড়ই গোপনে রাখিতেন। তাঁহার গুরু ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষা দান করিতেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিতেন "গোসাই কি ইহাদের দীক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন, যে শিষ্য করিতেছে। গুরুর নির্দেশ ব্যতীত কাহাকেও মন্ত্র দীক্ষা দিলে প্রত্যবয়ের ভাগী হইতে হয়। দীক্ষা প্রদান বড় দায়িত্বের কাজ। দীক্ষা দেওয়া সোজা কথা নয়।"

সতীশবাবুর গুরুদেব শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিতেন, ইনি গত দুই জন্মে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম। এই

জন্মটিও তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতই ব্যতীত করিতেছেন। এই শেষ আঠার বৎসর তাঁহার বাসস্থানে কোন প্রকার অন্নপাক হয় নাই। এক ভক্তের বাড়ী হইতে গুরুর ভোগের পর নিত্য প্রসাদ আসিত, তাহাই তিনি প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। গুরুকৃপায় তিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। ইহাকেই তিনি পরম পুরুষার্থ বলিয়া মানিতেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভারতরত্ন, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাঃ হারাণ-চন্দ্র চাকলাদার, ডাঃ বিনয় কুমার সরকার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি ভারতের প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ, মহাত্মা আদর্শ গুরুভক্ত ঋষি-কল্প শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আই, সি, এস (I.C.S.) পরীক্ষা দিবার জন্য তিনিই বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (Vice-chancellor) সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসতীশবাবুর বাল্য বন্ধু ছিলেন। উভয়ে এক সঙ্গে বহুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে (Calcutta Presidency College) পড়িতেন। আশুতোষ ক্লাসে গণিতে প্রথম ছিলেন আর সতীশচন্দ্র ছিলেন ইংরাজীতে। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রগাঢ় সৌহৃদ্য ছিল। সতীশবাবু যখন কাশীবাস করিতেছিলেন সেই সময় একবার সার আশুতোষ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। বহু কাল পর দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকার হয়। অনেকক্ষণ দুইজনে বহু কথাবার্তা বলিলেন। সার আশুতোষ সতীশবাবুর বিচার ও জীবন-ধারাদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। বিদায়ের সময় তিনি

বলিয়া গেলেন, 'সতীশ! পড়ার এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের সময় আমরা দুইজনে সমান সমান ছিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমিই জিতে গেলে আমি হারিলাম।"

অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান ঋত্বিক দেশনায়ক শ্রীযুক্ত এম, কে, গান্ধীজী সতীশবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে যখন তিনি প্রথম সতীশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে পত্র ব্যবহার নিয়মিতরূপে চলিত। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে এবং ইয়ং ইণ্ডিয়ার (Young India) সম্পাদনে শ্রীসতীশ-বাবু শ্রীগান্ধীজীকে নানাভাবে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (প্রথম রাষ্ট্রপতি) গান্ধীজীর পরম ভক্ত এবং সতীশবাবুর ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যস্থানীয়। তাঁহার মাধ্যমে উভয়ের ভাব বিনিময় সর্বদা চলিত। সতীশবাবু গান্ধীজীর নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ, নিষ্ঠা, শুদ্ধবৃত্তি এবং অহিংস ও উদার ভাবধারাদ্বারা অত্যধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেব ছিল যথেষ্ট। সতীশবাবু ছিলেন পরম গুরুভক্ত। গুরুর কৃপাতেই তিনি পূর্ণরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। তিনি সদ্‌গুরু লাভকরতঃ এবং নিজেকে সর্বভাবে তাঁহার অধীন রাখিয়াই জীবনে কৃতার্থতা প্রাপ্ত করেন। তাঁহার দেহ-ধারণের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করা এবং তাহার নিমিত্ত পূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট থাকা। এ

বিষয়ে তিনি স্বীয় বিচার ও বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করিতেন না। "আজ্ঞা গুরুণামবিচারণীয়া" ছিল তাঁহার জীবনবেদ বা জীবনের নিয়ন্ত্রক নীতি। ইহা যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র তাঁহার আর কর্তব্যাকর্তব্য কি থাকিতে পারে? গান্ধীজীর বিচারধারা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল শুদ্ধ-ভাব এবং একান্তভাবে নৈতিক জীবন যাপনকরতঃ আপন বিবেকের বাণী অনুসরণ করা ও উহার অনুরূপ জীবন সঞ্চালিত করা। তিনি অবশ্য ইহা মানিতেন যে বিবেকের বাণী কদাচিৎ ভুলও হইতে পারে। কারণ মনোময় ভূমিতে স্থিতি হইবার নিমিত্ত সংস্কারের প্রভাব বিবেকের উপর পড়া অসম্ভব নহে। এইজন্য তিনি বিবেকের বাণীকেও কল্পনা হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া কখন-সখন উহার পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু ইহাও অবশ্য তাঁহার সংশোধিত বিচারের বাণীর প্রভাবেই হইত। শেষ পর্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বিচারকেই তিনি কর্তব্যা-কর্তব্যের নিয়ামক বলিয়া মনে করিতেন। গুরুর আদেশ যদি যুক্তি-বিরুদ্ধ মনে হইত এবং স্বীয় বিবেকের প্রতিকূল প্রতীত হইত, তাহা হইলে তাহা তিনি মানিতে বা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরুষের দৃষ্টি কোণে গূঢ় সত্য নিহিত ছিল। সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিবেক অথবা বিচারের অবলম্বন না করিয়া উপায় নাই কারণ তাহা না হইলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় কি করিয়া হইবে? সদ্‌গুরুর প্রাপ্তির পর হৃদয়ে বিচার-বুদ্ধির জন্য কোন স্থানই থাকে না। শ্রীগান্ধীজী বহু স্থানে আত্মবিচার বা Introspection করিবার সময় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার চিত্ত-বৃত্তির ধারাই এমন যে তাঁহার পক্ষে সেই সময় গুরু-প্রাপ্তি হওয়া

কঠিন ছিল। অতএব লৌকিক দৃষ্টি কোণ হইতে গান্ধীজীর বিচার ঠিক এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ হইতে সতীশবাবুর।

সমগ্র ভারতব্যাপী যখন স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলিতেছিল সেই সময় শ্রীগান্ধীজীর নিকট বহু স্থান হইতে আন্দোলন পরিচালনের জন্য পর্যাপ্ত ধনাগম হইত। সতীশবাবু তাঁহার গুরুর আদেশে অধ্যাপক শ্রীকৃপালিনীর মারফত শ্রীগান্ধীজীর নিকট মাত্র এক শতটি টাকা পাঠাইয়া তাহাকে জানাইলেন, "দেশের কাজের নিমিত্ত আপনার নিকট অজস্র অর্থাগম হইতেছে, কিন্তু আপনার সেবার জন্য কেহ কিছু পাঠাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আপনার সেবার জন্য যৎকিঞ্চিত পাঠাইতেছি। আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে সুখী হইব।" Father of the Nation শ্রীগান্ধীজী শ্রীকৃপালিনীজীকে বলিলেন, "তুমি আমার হইয়া শ্রীসতীশবাবুর চরণে মাথা রাখিয়া বলিও "আমি তাঁহার প্রীতির দান সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি।" তিনি সতীশবাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন পক্ষান্তরে শ্রীসতীশবাবুও শ্রীগান্ধীজীকে স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া অতিশয় সম্মান করিতেন। সতীশবাবু গান্ধী-মাহাত্ম্য নামে একখানি অতি মূল্যবান ও উপাদেয় পুস্তক ইংরাজীতে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহাতে সারা পৃথিবীর মনীষীগণের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ শ্রীগান্ধীজীর প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান্ সেক্শনের ভূতপূর্ব প্রথম ও প্রধান সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এই পুস্তকখানির Mahatma Gandhi A World—Redeemer

নাম দিয়া একটি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা ইংরাজী ভষায় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এষণা বা ইচ্ছা ত্যাগপূর্বক আত্ম-দর্শন। বাসনার মধ্যে লোকবাসনা, বিত্তবাসনা ও পুত্রবাসনাই প্রধান অপর বাসনা সকল এই তিনেরই অন্তর্গত। এই সকল বাসনাদ্বারাই মানুষ সংসারে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ প্রকারে বাসনা ত্যাগই সন্ন্যাস বা সন্ন্যস্ত হওয়া। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া যদি জীবনে ত্যাগের ভাব না আসিল তাহা হইলে সন্ন্যাসের সার্থকতা কি? অহংকারই সকল দুঃখের বা বন্ধনের মূলকারণ। সেইজন্য সতীশবাবু গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী না হইয়া আপন অহংসত্তাকে সন্ন্যস্ত বা সম্পূর্ণ-ভাবে বিনাশকরতঃ শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রকৃত আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়া মানব-জনম সফল করিয়াছিলেন।
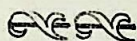
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নবম কুসুম লিখিতে বিষয়-বস্তু বিবিধ স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার কিছু অংশ আহৃত হইয়াছে পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখনিঃসৃত বাণী হইতে, কিছু প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে ডাঃ ভগবতী প্রসাদ সিংহ লিখিত 'মনীষী কী লোকযাত্রা' নামক হিন্দী পুস্তক হইতে, একটি বিশেষ ঘটনা আহরণ করা হইয়াছে বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ও জনপ্রিয় প্রবীণ অধ্যাপক পরম প্রীতিভাজন ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'অথ মহাজন-সংবাদ' হইতে এবং কিছু সংগৃহীত হইয়াছে পরম স্নেহভাজন শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসুর নিকট হইতে। এইজন্য গ্রন্থকার উপর্যুক্ত চারিজনের নিকট ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঃ দণ্ডীস্বামী শ্রীনারায়ণানন্দ তীর্থ কর্তৃক সঙ্কলিত কয়েকখানি পুস্তক ঃ

১। অদ্ভুতরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের অন্তর্গত শ্রীরামগীতা মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা—

২। ভগবান্ শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্য প্রণীত বিবেক-চূড়ামণি মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা—

৩। অজ্ঞাত বনকুসুম—সন্ন্যাসী, তপস্বী, যোগী ও ভক্তদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ।

৪। ভগবান্ শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্য বিরচিত ব্রহ্মানুচিন্তনম্ মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা—

৫। দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা—বিস্তারিত পূজাপদ্ধতি—

৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ পদ্ম-বিভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

৯৪, ভদৈনী, বারাণসী-২২১০০১